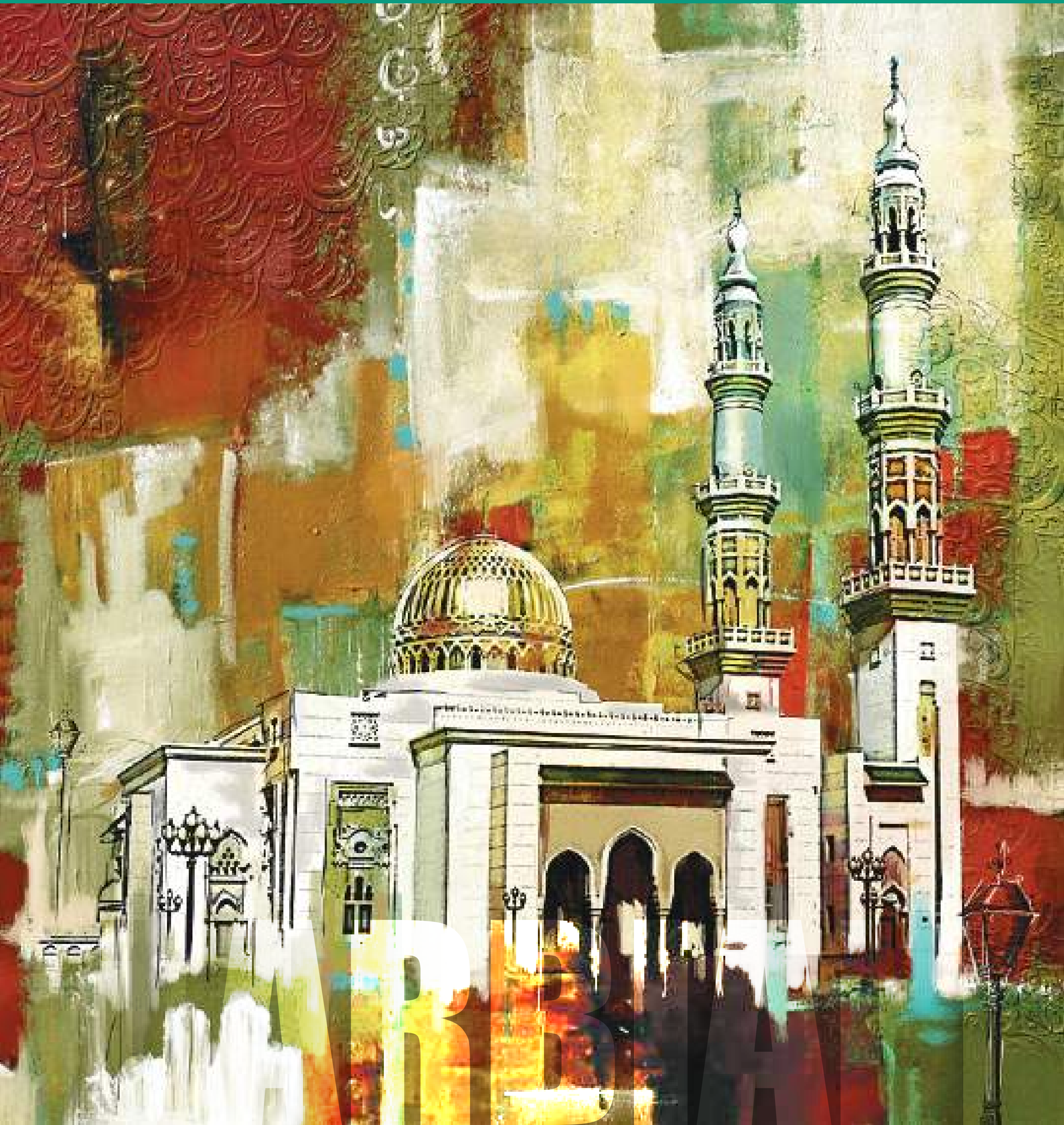
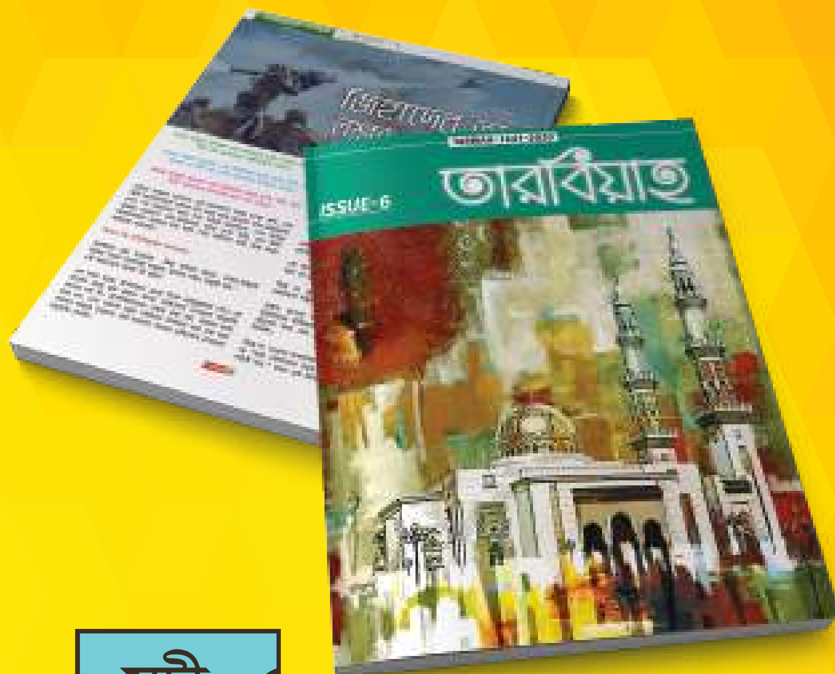
TARBIAH-1441-2020

ISSUE-6

# তারবিয়াহ



AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস




# সূচী

# মানবাধিকারের বর্তমান রূপ ও আমাদের করণীয়



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রশংসা রব্বে জালাল মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে, যিনি আমাদেরকে খোরাসানের বিজয়ী কাফেলার সাথে দ্বীনের সহিহ রাস্তায় এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ সমরবিদ, নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তার পরিবার-পরিজন, সাথীবর্গ ও কেয়ামত পর্যন্ত আগত দ্বীন ও ইসলামের অনুসারী মুজাহিদিনদের উপর।

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ!
'তারবিয়াহ' ম্যাগাজিনের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশের পথে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট লেখক, পাঠক, প্রস্তুতকারী এবং শুভাকাঙ্ক্ষী সকল ভাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন। আমাদের এই সংখ্যায় রয়েছে, জিহাদের উদ্দেশ্যসহ পূর্বসূরিদের কিছু স্মৃতিচারণ। এছাড়া হক্কের প্রতি উদ্বুদ্ধকারি আরো কিছু পাথেয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন, আমীন।

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ!
বর্তমানে গোটা বিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে চলছে বেহায়াপনার প্রতিষ্ঠা। সেই সাথে চলছে মুসলিম নিধনের প্রতিযোগিতা। কেউ কেউ তো দাবি করছেন, বর্তমান দুনিয়া শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাফল্যের চরম শীর্ষে অবস্থান করছে। তবে এ কথা বলা হয়তো সঠিক যে, অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমান দুনিয়া শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে ঈর্ষনীয় অগ্রগতি ও সফলতা লাভ করেছে। আবার সভ্য ও সুশীল বলে দাবিদার এ সভ্যতার মানুষের একাংশ কতটা নিকৃষ্ট ও বর্বর হতে পারে তাও কিন্তু আমরা অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করছি।

চলমান ঘটনাপ্রবাহ একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলে আমরা ব্যথিত-নির্বাক হয়ে যাই। একদিকে চলছে মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়নের অবিশ্রান্ত প্রয়াস, আর অপর দিকে দেখা যাচ্ছে মানবতা দলনের ভয়ানক চিত্র। মানবিক মূল্যবোধ ও মানবতাকে ধ্বংস করার পশ্চিমা পরিকল্পনা ও মারণাস্ত্রের ঝলকানি আমাদের সকল চিন্তা-ভাবনা ও সফলতাকে ম্লান করে দিচ্ছে। মানুষের মৌলিক অধিকারের নামে সারাক্ষণ যারা বক্তৃতার খই ফুটাচ্ছে সেই পশ্চিমা শক্তি যখন গায়ের জোরে অন্যের দেশ ও সম্পদ দখলের প্রয়াস চালাচ্ছে তখন প্রশ্ন জাগে আমরা এ কোন মানবতার কথা বলছি?!!

গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তির পতাকা উড়িয়ে পশ্চিমের দেশগুলো যখন আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, লেবানন, বসনিয়া, কাশ্মীর ও ইরাকসহ দুনিয়ার বিভিন্ন জনপদে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে, লুণ্ঠন চালায়, চালায় ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ, তখন প্রশ্ন জাগে এরা কোন মানবতা ও গণতন্ত্রের কথা বলছে!! সভ্যতার মুখোশধারী এই তথাকথিত দেশগুলো হচ্ছে আমেরিকা, ইসরাইল, ভারত ও ইউরোপভুক্ত দেশসমূহ। মানবতা ও সভ্যতার কথার আড়ালে তারা চালাচ্ছে অসভ্য আচরণ। বিশেষ করে এই উপমহাদেশে মুসলিম নিধনে মাতাল হয়ে উঠেছে গেরুয়া সন্ত্রাসী বাহিনী ভারত সরকার।

আজকের সভ্য দুনিয়ায় মানবতার কল্যাণ ও মানবাধিকার বিকাশের জন্য বহু সংস্থা, এমনকি জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক শয়তানি সংগঠনও নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। প্রায়শই আমরা এসব সংস্থা বা সংগঠনের পক্ষে পক্ষপাতমূলক এবং একপেশে আচরণের অভিযোগ লক্ষ করি। অভিযোগ রয়েছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো সবসময় শক্তির পক্ষে কাজ করে এবং বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা ছাড়া মানবতাকে আর কিছুই এই সংস্থা বা ফোরাম দিতে পারেনি। অথচ আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মানবিক তৎপরতা প্রদর্শন করেছেন তার সামান্যতমও আজ কোথাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না একমাত্র মুজাহিদিনদের অধীনের এলাকাগুলো ছাড়া। বর্তমানে মানুষরূপী হায়েনারা দুনিয়ার দেশে দেশে অকাতরে মানুষ খুন করছে। আধুনিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানোর জন্য মানুষকে তার শিকারে পরিণত করছে। বিভিন্ন দেশ দখলের সময় মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে এরা মানুষকে ধরে পশুর মতো খুন করছে। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই এরা নিরপরাধ শিশু-মহিলা ও পুরুষ যুদ্ধবন্দীদের পর্যন্ত নির্বিচারে হত্যা করছে। অথবা হাত-পা চোখ বেঁধে খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখছে, কিংবা লোহার ছোট খাঁচায় বন্দী করে অনাহারে দিনের পর দিন ফেলে রাখছে। এ ধরনের আচরণ আমরা লক্ষ্য করছি চীনের উঁইঘুরে, প্রতিদিন লক্ষ্য করছি ফিলিস্তিনে। ইরাক, আফগানিস্তান, আরাকান, কাশ্মীর এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাচ্ছি। মুসলিম বিশ্বের যেখানেই খ্রিষ্টান-ইহুদি লবির আগ্রাসন ও জবরদখল দেখা যায় সেখানেই মানবতা ও মানবিকতার চরম লঙ্ঘন লক্ষ্য করা যায়। এদের পশুশক্তি গোটা দুনিয়ার মানবিকতা ও সততাকে ছারখার করে দিয়েছে।

সিরিয়ায় লাখ লাখ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা, ফিলিস্তিনে যুগ যুগ ধরে অগণিত মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয়া, কাশ্মীর, চেচনিয়া, আলজেরিয়া ও অন্যান্য অনেক দেশে নিরপরাধ মুসলিম শিশু-মহিলা ও অসহায়-নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা ও শোষণ আধুনিক সভ্যতার এক দুর্ভাগ্যজনক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তাই মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সর্বত্র আজ প্রশ্ন উঠেছে সভ্যতা ও মানবাধিকার নিয়ে। পশ্চিমাদের এই বক্তৃতাসর্বস্ব মানবাধিকারের নাটক ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে চিন্তাশীল মানুষকে আজ ভাবিয়ে তুলছে। সত্যিকথা বলতে কি, ইসলামিক ইমারাহ ছাড়া প্রকৃত মানবাধিকার এখন কোথাও প্রতিষ্ঠিত নেই। ফলে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আজ হাঁপিয়ে উঠেছে। তারা বর্তমান সভ্যতার পশুত্ব ও বর্বরতা থেকে মুক্তি পেতে উদগ্রীব হয়ে পড়েছে। কিন্তু শান্তির পথ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একমাত্র ইসলাম ছাড়া কোন ধর্মমত, আদর্শ কিংবা মতবাদ মানুষকে স্থিতি ও স্বস্তির পথ দেখাতে পারবে না।

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ!

আসুন সংক্ষেপে জেনে নিই, জুলুম নির্মূলে ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের নবী কি ভূমিকা পালন করেছেন।

মানবতার অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার মানুষের জন্য পেশ করেছিলেন মানবতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর ঐশী পথ একটি বর্বর, অজ্ঞ, হানাহানিতে লিপ্ত সমাজকে কিভাবে আলোর পথে পরিচালিত করেছিল তা সবারই জানা। তিনি মানবতা ও সুস্থ মানসিকতার এমন এক সমাজ কায়েম করেছিলেন, যা দুনিয়ার কোনো সময়ে মানুষ কখনও দেখেনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মানবতাবোধ ছিল আল্লাহর দেয়া উত্তম আদর্শসমৃদ্ধ।

ইসলামপূর্ব আরবে মনুষ্যত্ব ও মানবতা বলতে কিছুই ছিল না। মানুষে মানুষে মারামারি, হানাহানি ও যুদ্ধকলহ সেই সমাজের স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। সত্যিকথা বলতে কী, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত ইসলাম সেই সমাজের ঘৃণিত ও বর্বর মানুষকে মানবতার উৎকর্ষে আলোকিত করেছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিরল মানবতাবোধ ও উদারতা দিয়ে একটি অসভ্য ও পশু সমাজকে সুখ-শান্তি, সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে সফল হয়েছিলেন। তাঁর মানবতাবোধ যে কত সুউচ্চ ছিল তা অবলোকন করে এখনও অবিশ্বাসীরা হতবাক হয়ে যায়।

আমরা জানি, তিনি জীবনে বহু কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, অত্যাচারিত ও অপমানিত হয়েছেন। তবুও তিনি কাউকে কোনো কটু কথা বলেননি। তাঁর চরম শত্রুকে হাতের কাছে পেয়েও তিনি তাকে হাসিমুখে ক্ষমা করে দিয়েছেন। মক্কার কুরাইশদের দ্বারা অত্যাচারিত ও অপমানিত হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময় মদিনায় হিজরত করেন। অথচ তিনি যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন পলায়নরত শত্রুদের থেকে কোনো প্রতিশোধ নেননি নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ছাড়া, বরং তাদের নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেন। মানবতার নবী সেদিন ঘোষণা করলেন, 'আজকের দিনে তোমাদের কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।'

মানুষের মর্যাদাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বললেন, 'মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে, যে মানুষের উপকার করে'। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ ও মানুষের কল্যাণ নিয়ে যে কতটা আন্তরিক ও পেরেশান ছিলেন তা তাঁর কিশোর বয়সেও লক্ষ্য করা যায়। আরবের রক্তাক্ত ও খুনঝরা সমাজের অধঃগতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। তাই মানুষের মধ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি গঠন করেন হিলফুল ফুজুল সংগঠন। এই সংগঠনের মূল কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ:

১. সবাই মিলে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা।
২. অত্যাচারীর হাত থেকে নিরীহ ও মজলুম মানুষকে রক্ষা করা ও জালিমদের দমন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা।
৩. দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে যথাসম্ভব সহায়তা করা।
৪. বিদেশী লোকদের জান-মাল ও মান-সম্মান রক্ষার চেষ্টা করা।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর এই কর্মসূচি দুনিয়ার ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামরিক অভিযানকালে নারী ও শিশুসহ যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণের যে নজির স্থাপন করেছেন আজকের দুনিয়ায় তা সত্যিই বিরল। তিনি বলেছেন, 'বন্দীদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করো।'

ইসলামের প্রথম জিহাদে মুসলমানদের বিজয়ের পর যেসব কাফের সৈন্য যুদ্ধবন্দী হয়েছিল তাদের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীরা যে অসাধারণ আচরণ করেছিলেন তা দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায়নি। সাহাবারা যুদ্ধ শেষ করে যখন মদিনায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন তাঁরা পায়ে হেঁটে গেলেন আর বন্দীদের উটের পিঠে আরোহণ করিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁরা বন্দীদের রুটি খেতে দিলেন আর নিজেরা খেলেন শুকনো খেজুর। কিন্তু আফসোস! আজ মুসলিম বন্ধীদের সাথে কি নির্মম আচরণ করা হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করাও অসম্ভব।

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ!

পরিশেষে আমি বলব, জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী খিলাফাহ কায়েম হওয়া ছাড়া মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই আসুন আমরা গাযওয়ায়ে হিন্দের কাফেলাভুক্ত হয়ে ইসলামী খিলাফাহ কায়েমের লক্ষ্যে সম্মুখ পানে এগিয়ে যাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে বিজয় দান করুন, আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**********



# জিহাদের অর্থ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ :- হাম্মাদ সাইফুল্লাহ

আমরা আল্লাহ সুবহানা ওয়া-তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি এই জামাতকে মহিমান্বিত করেন।

আমরা আল্লাহ সুবহানা ওয়া-তাআলার কাছে দু'আ করি, যেন আমরা যা শিখি তা থেকে আমাদের উপকৃত করেন।

আমরা আল্লাহ সুবহানা ওয়া-তাআলার কাছে দু'আ করি, যেন তিনি আমাদের উপকারী জ্ঞান দান করেন।

আমরা আল্লাহ সুবহানা ওয়া-তাআলার কাছে দু'আ করি, যেন তিনি আমাদেরকে তাদের মত করে গড়ে তোলেন যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পথ অনুসরণ করে এবং তাঁকে ভালবাসে। এবং আমরা আল্লাহ সুবহানা ওয়া-তাআলার কাছে দু'আ করি, যেন তিনি আমাদেরকে তাদের মত করে গড়ে তোলেন যারা তার সাথে জান্নাতে থাকবেন।

## জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অপব্যাখ্যা:

কুরআনে যুদ্ধ সংক্রান্ত কিছু আয়াত আছে। যেমন-আল্লাহ বলেন,"তারা যেখানেই থাকুক, তাদের সাথে লড়াই কর।" এই আয়াতের ব্যাখ্যা কি হবে?

এর মানে হচ্ছে, ইসলামের প্রথম দিকে রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাদের সাথে যুদ্ধ করার কিংবা প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নি। মুসলিমদেরকে প্রহার করা হত, তাদের হত্যা করা হত, এবং তাদের প্রচুর পরিমাণে নির্যাতন করা হত আর তখনও আল্লাহ সুবহানা ওয়া-তাআলা তাদের প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেননি।

অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াত নাজিল করার মাধ্যমে "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে" মুসলিমদেরকে প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

আর আমরা আজ রাতে যে আয়াতগুলো পড়লাম, এগুলো মূলত আল্লাহ তা'য়ালা বদর, উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল করেছেন।

মনে রাখবেন, এই আয়াতগুলো আজকে আপনার আর আমার জন্য নির্দেশ নয়।

এগুলো হচ্ছে কুরআনে বর্ণনা করা ইতিহাসের দলিল যেখান থেকে আমরা উদাহরণ পেতে পারি। তো আপনি কিছু অমুসলিমদের পাবেন যারা কুরআন সম্পর্কে বলে যে কুরআন সন্ত্রাসবাদ প্রচার করে।

কিন্তু না, কুরআন কখনও সন্ত্রাসবাদ প্রচার করে না বরং কোরআন সন্ত্রাসবাদকে সুস্পষ্টভাষায় হারাম ঘোষণা করেছে।

প্রকৃত ব্যাপার হলো তারা কুরআনকে বুঝতে পারে নি। কুরআনের ইতিহাস সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে তারা এমনভাবে অনুবাদ করে যেন এগুলো হচ্ছে আপনার আর আমার জন্য নির্দেশ।

কিন্তু না, এগুলো আমাদের জন্য নির্দেশ নয়। যখন আল্লাহ বলেন যে "যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর।" তখন এটা তিনি মূলত রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়কার

লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন।

এবং আল্লাহ সুবহানা ওয়া-তাআলা আরো বলেছেন:-

"তাদের সেই একই জায়গা থেকে বিতাড়িত কর যেখান থেকে তারা তোমাদের বিতাড়িত করেছে।"

সেই জায়গাটা কোনটা ছিল? সেটা ছিল মক্কা থেকে মুকাররামা। মুমিনগণ মক্কা থেকে মুকাররামায় বিতাড়িত হয়েছিলেন।

তাই আল্লাহ সুবহানা ওয়া-তাআলা তাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে এখন তোমাদের অনুমতি আছে যে তোমরা তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করতে পার।

তাই এখন আমাদের সেভাবে আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করা উচিৎ না যেভাবে অমুসলিমরা চায়। যাতে করে তারা আমাদেরকে একদল সন্ত্রাসী ডাকতে পারে, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুক, অথচ আমরা সন্ত্রাসী নই।

ইসলাম শান্তিতে পরিপূর্ণ, এর মানে হচ্ছে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তির বানী প্রচার করা, পৃথিবীর সকল মানুষকে শান্তির প্রতি আহবান করা ও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, আর আমাদের সবার এটা বোঝা দরকার।

তাই আমাদের অবশ্যই তাদের ফাঁদে পা দেওয়া উচিৎ নয়। আমাদের বুঝতে হবে যে এই আয়াতগুলো এমন ঘটনার সাথে জড়িত যা ইতিহাসে ঘটেছে।

আমাদের সেখান থেকে শিখতে হবে। ঠিক অন্যান্য ইতিহাসের বইগুলোতে লিপিবদ্ধ অমুসলিমদের দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধগুলোর মতই।

ঐসব বইগুলোর ইতিহাস থেকে কেউ বলে না যে, ব্রিটিশরা বর্বর বা আমেরিকানরা বর্বর, যদিও বইগুলোতে তাদের বর্বোরচিত অতীত ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু এরপরও তাদেরকে আমরা সন্ত্রাসী বলিনা বরং আমরা এগুলো থেকে শিক্ষা নেই যে তারা কি করেছিল।

তারাও তাদের অতীত কৃতকর্ম থেকে শিক্ষা নেয়। ঠিক একই জিনিস এখানেও বিদ্যমান।

কুরআনে তিনটি উপাদান আছে, একটাতে আমাদের পূর্ব জাতিদের তথ্য আছে; আরেকটাতে আছে ইতিহাসের উপাদান এবং অন্যটাতে আছে ভবিষ্যতে কি হবে সে ব্যাপারে তথ্য ও ভবিষ্যৎ বাণী।

এতে রয়েছে আমাদের নিজ জীবন পরিচালনার নিয়ম-রীতি, আদেশ-নিষেধ, বিচারব্যবস্থাসহ সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ।

এগুলো হচ্ছে কুরআনের তিন ধরণের আয়াত। তো আমরা যে আয়াতগুলো আজ পড়লাম তা শুধু রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়ে কার্যকর হবে এবং এগুলো অবশ্যই আমাদের সবার জন্য শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু আমরা ভুল বুঝব না যখন একজন অমুসলিম একজন সাধারণ মুসলিমের কাছে এসে কুরআন দেখিয়ে বলে যে এই আয়াতগুলো দেখো, এগুলো তোমাদের বলছে যে "যাও এবং কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর।"

না, এই আয়াতগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সময়ের মানুষদের উদ্দেশ্য করে বলছে।

এই আয়াতগুলো নাযিলের পেছনে কারণ আছে। আল্লাহ আমাদের বুঝ দান করুন এবং আমি আশা ও দুয়া করি, যেন সবাই এটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে যে ইসলাম অবশ্যই সেটা যা শান্তি প্রচার করে।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ব্যাপারে কিছু সাধারণ আলোচ্যবিষয়। বিশেষভাবে এই বিষয়টির উপর মন্তব্য করাটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মদিনার দশ বছর সময়কালে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৯টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উপরন্তু তিনি ৫৫টি অভিযান পাঠান যেখানে তিনি অংশগ্রহণ করেননি।

এগুলো সব যোগ করে আমরা দশ বছর সময়ে ৭০টা যুদ্ধের হাদিস পাই, তার মানে বছরে ৭টা যুদ্ধ।

সুতরাং এটা এমন একটা মহান কাজ যার পেছনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবারা এত সময় দিয়েছিলেন, যে এই বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

মনে রাখবেন যে একটা যুদ্ধপ্রস্তুতির পেছনে অনেক সময় ব্যয় হয়। মানে একটা সৈন্যবাহিনীর অর্থায়ন, সৈন্যসমাবেশ ও সংঘবদ্ধ করতে; তারপর তাদের বাইরে পাঠাতে এবং তাদের ভ্রমণে ও ফিরে আসতে কয়েক মাস লেগে যায়।

তাই এটা সদ্যগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অনেক বড় একটা বোঝা ছিল। তাই এটা এমন একটা বিষয় যার পেছনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত সময় ও শ্রম উৎসর্গ করেছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে কেন? এবং কীভাবে?

২য় কারণটি হচ্ছে যে বিষয়টি আজ এত বিতর্কিত হয়ে উঠেছে এবং আমরা অগ্র-পশ্চাতে এত সব ভিন্ন মতামত শুনি জিহাদের ব্যাপারে যে, জিহাদের আসল অর্থ কি, এটার উদ্দেশ্য কি, এটার লক্ষ্য কি, এটার পেছনে কি প্রজ্ঞা আছে তা বুঝতেই পারি না।

তাহলে এর মানে কি আর এর পেছনে কি প্রজ্ঞা আছে। জিহাদ শব্দটার নিজস্ব অর্থ হল যুদ্ধ। এটার উৎপত্তি 'জুহুদ' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'চেষ্টা', 'চেষ্টা করা'।

তাই শব্দটির ভাষাগত অর্থ হচ্ছে 'চেষ্টা করা' বা 'যুদ্ধ করা'। এই শব্দটি পরে একটি বিশেষ ইসলামী অর্থ বহন করে। আরবি ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যাদের ভাষাগত একটা অর্থ ছিল কিন্তু ইসলাম শব্দটির একটি নতুন অর্থ দান করে।

উদাহরণস্বরূপ, সালাত শব্দটির আসল অর্থ 'মিনতি' কিন্তু ইসলামে এটা একটা নতুন অর্থ বহন করে তা হল নামায।

তাই এখন যখন আপনি বলেন যে, চল সালাতের উদ্দেশ্যে যাই, আমার মনে হয় যে কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ বোঝাচ্ছ না ভাষাগত অর্থ বোঝাচ্ছ না ইসলামী অর্থ বোঝাচ্ছ?

এই শব্দটি একটি ইসলামী পরিভাষাগতশব্দ। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ক্ষেত্রেও একই বিষয়; এটি একটি নতুন অর্থ বহন করে আর তা হল, আল্লাহ আয ওয়া-জাল্লাহর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা যারা তার ধর্মকে অস্বীকার করে।

আর চারটি মাযহাবই এই বিষয়ে একমত যে এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ আয ওয়া-জাল্লাহর পথে যুদ্ধ, তাই এটি এই নতুন অর্থ বহন করে এবং আমরা এই শব্দটি ব্যবহার করলে শর্তহীনভাবে এটিই বোঝায়।

প্রিয় ভাই-বোনেরা, একমাত্র "আল্লাহ আয ওয়া-জাল্লাহর পথে যুদ্ধ" ছাড়া বাকি সকল যুদ্ধই অসৎ। এবং প্রতিটি যুদ্ধ, প্রতিটি রক্তপাতই অসৎ কিন্তু শুধুমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে "আল্লাহ আয ওয়া-জালের পথে যুদ্ধ।"

আর তার প্রমাণ হচ্ছে কুরআনে সূরা নিসার একটি আয়াত। আল্লাহ আয ওয়া-জাল বলেন:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿76﴾

যারা ঈমানদার তারা যে, জিহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। (সূরা আন-নিসা: ৭৬)

আল্লাহ বলেছেন যে যুদ্ধ দুপ্রকার, একটা যুদ্ধ আল্লাহর জন্য করা হয় আরেকটা করা হয় তাগুতের জন্য আর তাগুতের অর্থ হল মিথ্যা উপাসনার বস্তুসামগ্রী বা সেসব সীমালঙ্ঘনকারীরা যারা অন্যায়ভাবে শাসনের ঐশ্বরিক অধিকার দখল করে।

আল্লাহ বলেছেন যে ঈমানদারা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করছে এবং তা একটি গ্রহণযোগ্য এবং পুরষ্কারযোগ্য কাজ। আর যারা কাফের তারা তাগুতের পক্ষে লড়াই করে; তারা তাদের যুদ্ধের যেই কারণই দর্শাক না কেন, এটা হচ্ছে অসৎ, আল্লাহ বলছেন এটা অসৎ কাজ।

এটা আগ্রাসনের যুদ্ধ হোক, সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ হোক, ঔপনিবেশিক যুদ্ধ হোক, এক জাতির অন্য জাতির উপর কর্তৃত্বের যুদ্ধ হোক বা এক জাতিগত গোষ্ঠীর অন্য জাতিগত গোষ্ঠীর উপর কর্তৃত্বের যুদ্ধ হোক, এটা গনতন্ত্র ছড়ানোর নামে যুদ্ধ হোক, এটা অমুক অমুক মানুষদের নিপীড়ন বা একনায়কতন্ত্র থেকে মুক্ত করার নামে হোক, এগুলো সবই হচ্ছে অসৎ কাজ।

এবং একমাত্র ন্যায়নিষ্ঠ যুদ্ধ হচ্ছে তা, যা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকার নিচে করা হয়, অন্য কোনো যুদ্ধ নয়। তাই প্রথমেই এই নীতিটি বিবৃত করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনারা অনেককেই বলতে শোনেন যে ইসলাম হিংস্রতা এবং যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করে।

ইসলাম যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করে, এটা সত্য নয়।

ইসলাম সব ধরণের যুদ্ধের, সব ধরণের রক্তপাতের, সব ধরণের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যদি না তা আল্লাহর জন্য করা হয় যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যার আমাদের কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল সেটা দেখানোর অধিকার আছে।

দেখেন, আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সেকারণে শুধু তারই অধিকার আছে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সেটা নির্ধারণ করার। কোনটা অন্য জিনিসের উপর অগ্রাধিকার বহন করে।

উদাহরণস্বরূপ সপ্তাহে সাতটি দিন আছে, এগুলো সবকয়টিই সমান। শুক্রবার, শনিবার, রবিবার ও অন্যান্য দিনগুলোতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন পার্থক্য নেই, তারা সকলেই সমান।

যাইহোক আল্লাহ আমাদের বলেছেন যে জুমাহ (শুক্রবার) সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোর চেয়ে পছন্দনীয়।

যেহেতু আল্লাহ আয ওয়া-জাল এই দিনগুলো সৃষ্টি করেছেন তাঁর অধিকার আছে আমাদের বলার যে কোন দিনটা বেশি ভাল।

সৌরজগৎ ও চন্দ্রসূর্যের আবর্তনের দিক দিক দিয়ে চিন্তা করলে রমজান মাস এবং বছরের অন্যান্য মাসগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। রমজানকে অন্যান্য মাসের চেয়ে আলাদা দেখায় না, তারা সবাই সমান।

যাইহোক, আল্লাহ আয় ওয়া-জাল রমজানকে বছরের সবচেয়ে পছন্দনীয় মাস হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ নেক কাজের পুরষ্কার দানের জন্য জুল হিজ্জাহ এর প্রথম দশ দিনকে নির্বাচন করেছেন যেমনভাবে তিনি রমজানের শেষ দশ রাত্রিকে বছরের

সবচেয়ে পুরস্কারযোগ্য দিন হিসেবে ঠিক করেছেন এবং তারপর ঐ দশ রাত্রি থেকে তিনি বিজোড় রাত্রিগুলোকে সেরা হিসেবে এবং ঐ বিজোড় রাত্রিগুলো থেকে তিনি লাইলাতুল ক্বদরকে বছরের সেরা রাত্রি হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

আল্লাহ আয ওয়া-জাল সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আর তারপর তিনি তার সৃষ্টি থেকে নির্বাচন করেন কোনটা অন্যগুলোর চেয়ে বেশি প্রাধান্যপ্রাপ্ত। তাই এটা করার অধিকার শুধু আল্লাহর আছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্রেও তাই; এগুলো সবই খারাপ সেটা ব্যতিত যা আল্লাহ ভাল হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন।

### এখন, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর উদ্দেশ্য কি?

এটা হচ্ছে মানুষকে একে অন্যের বশ্যতা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা। তাই আমাদের কোন সৃষ্টির দাস না হয়ে, চাই সেটা মানুষই হোক বা পাথর বা মূর্তি বা আকাশচর কোন দেবতা হোক না কেন, আল্লাহ আয ওয়া-জাল চান যেন আমরা তাঁরই বান্দা হই।

সুতরাং জিহাদ আমাদের আসলে বাতিল মা'বুদের ইবাদত থেকে মুক্ত করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে আসে। এবং এটি হচ্ছে মানুষকে ইসলামের সৌভাগ্যশীল শাসনে আনার একটি উপায়, চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক। কারণ আমরা জানি, "ধর্মে কোন বলপ্রয়োগ নেই" মানুষকে মুসলিম হতে বাধ্য করা ইসলামে হারাম।

যাইহোক, যদি তারা ইসলামী শাসনের অধীনে থাকে তবে তাদের মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে বলেন, "আল্লাহ আয ওয়া-জাল তাদের দেখে বিস্মিত হন যাদের শিকল পড়িয়ে জান্নাতে আনা হয়।"

আলেমদের একজন এই হাদিসের উপর মন্তব্য করেন যে, এই হাদিসটার মানে হচ্ছে, "এই লোকদের ইসলামে টেনে আনা হয়েছে যদিও তারা তা চায় নি এবং তা তাদের জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ হয়েছে।"

সাধারণভাবে মানুষ ধর্মের ব্যাপারে শুনতে আগ্রহী নয়। মানুষ জানতে চায় কীভাবে অর্থ রোজগার করা যায়। তুমি যদি অমুসলিমদের কাছে ঘোষণা দাও যে, ইসলাম সম্পর্কে একটি লেকচার অনুষ্ঠিত হবে, মানুষ আসবে না অথবা তারা আসলেও তুমি বড় কোন সাড়া পাবে না।

কিন্তু তুমি যদি ঘোষণা দাও যে যারা আসবে তারা ৫০ ডলার পাবে তাহলে মানুষ লেকচার হল ভাসিয়ে দেবে এমনকি তাদের জন্য যথেষ্ট আসনও থাকবে না। কেন? কারণ তুমি তাদের ৫০ ডলার সাধছ। এ ব্যাপারটা সুধু অমুসলিমদের জন্য নয় মুসলিমদের জন্যও সত্য।

মানুষ ফজর সালাতের জন্য মসজিদে আসে না, মসজিদ জুমার সময় পরিপূর্ণ থাকে কিন্তু ফজরের সালাতের সময় তাদের খুব ছোট একটি অংশ থাকে।

ধরা যাক, ১০%। কিন্তু আমরা যদি ঘোষণা দেই যে যারাই ফজরের সময় আসবে তারাই ২০ ডলার করে পাবে, তখন সবাই আসবে। প্রতিবেশীরা আসবে, সবাই আসবে, দূরে যারা থাকে তারাও আসবে আর তারা মসজিদে ভীড় জমাবে। কেন? কারণ তুমি তাদের ২০ ডলার সাধছ, মূলত মানুষ ধর্মের ব্যাপারে শুনতে আগ্রহী নয়।

তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রথম মক্কায় ঘোষণা দেন যে তিনি একজন রাসুল আর তিনি কুরাইশদের সকলকে জড়ো করেন এবং তিনি এটাকে অনেক জরুরী বুঝিয়েছেন এবং এটা আসলেই জরুরী।

তিনি ডাকছিলেন, "ওয়া সুবহাহ" এবং এটা ৯১১ ডায়াল করার মত, এটা জরুরী অবস্থা এবং এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষদের জড়ো করেন এবং তারপর তিনি তাদের বলেন, আমি তোমাদের আল্লাহর তীব্র শাস্তি থেকে সতর্ক করছি।

### আবু লাহাব কি বলেছিল?

তোমার কপালে অমঙ্গল রটুক, তুমি আমাদের এজন্য ডেকেছ? আবু লাহাব ক্ষেপে ছিল, কারণ সে তার দোকান বন্ধ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা শোনার জন্য এসেছিল এবং সে মনে করেছিল যে এটা গুরুতর কিছু ছিল। এবং দেখা যায় যে এটা ধর্মপ্রচারের জন্য ছিল এবং একারণে সে অনেক অস্থির ছিল।তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

আর তারপর আল্লাহ বলেন, "তার সম্পদ তার জন্য কি করবে?" এই সম্পদ যা তাকে ইসলাম থেকে দুরে রাখছিল, যা তাকে বার্তা শুনতে বাধা দিচ্ছিল, যা তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জড়ো করেছিল।

এই সম্পদ হাসরের ময়দানে তার জন্য কি করবে? কিছু না। বাস্তবে এটা তার পতনের কারণ হবে। তাই যখন সাহাবারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে আর মানুষদের ইসলামের শাসনাধীনে নিয়ে আসে তখন তারা শুনছিল। তখন তারা শুনছিল কারণ সাহাবারা তাদের শাসন করছিল এবং তাদের মানুষদের দাওয়াহ দেওয়ার কিছু কর্তৃত্ব ছিল এবং মানুষ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল কারণ তখন এটা সরকারের পক্ষ থেকে আসছিল।

এটা কোন ধর্মপ্রচারকের কাছ থেকে আসছিল না যে কোন রাস্তা বা বাজারের এক কোণে হাতে একটি লাউডস্পিকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর মানুষ তাদের কান বন্ধ করে পাশ দিয়ে হেটে

যাচ্ছে। তখন এটা একটা কর্তৃত্বপূর্ণ স্থান থেকে আসছিল এবং তখন মানুষ গুনোত্তর হারে ইসলামে প্রবেশ করছিল।

শুরুর দিকে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় দাওয়াহ দিচ্ছিলেন, শুধু গুটিকয়েক জন আগ্রহী ছিল। কিন্তু যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী রাষ্ট্রের পত্তন করেন এখন গোত্রগুলো শুনছিল, অন্য জাতিগুলো শুনছিল এবং তারা এটাকে গুরুত্ব দিচ্ছিল এবং তখন মানুষ হাজারে হাজারে মুসলিম হচ্ছিল।

রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৩ বছরের মক্কার ইতিহাসে তাঁর কতজন অনুসারী ছিলেন? ১০০? ২০০? ৩০০? কিন্তু মদিনায় তারা প্রতিবছর সহস্রহারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাই মক্কা বিজয়ের সময়ে রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১২,০০০ বা ১০,০০০ জনের বাহিনী ছিল এবং হাজাতিল ওয়াদা এর সময় ৯০,০০০। এবং যখন তিনি মারা যান তাঁর জানাযায় ১,১৪,০০০ জনের বেশি শরীক হয়। তো আপনার দেখলেন যে কীভাবে সংখ্যা বাড়ছিল কারণ তখন তাদের হাতে কর্তৃত্ব ছিল।

### তাহলে জিহাদ কোন কোন ধাপ অতিক্রম করেছিল?

ইবনুল কায়্যিম "যাদ-উল-মাআদ"- এ বলেন, শুরুর দিকে জিহাদের অনুমতি ছিল না। এটা নিষিদ্ধ ছিল। মুসলিমদের যুদ্ধ করার অনুমতি ছিল না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ধৈর্যশীল হও কারণ আমি অনুমতিপ্রাপ্ত হইনি। তাই শুরুতে ছিল ধৈর্যধারণ।

দ্বিতীয় ধাপে তিনি বলেন, এরপর এটার অনুমোদন ছিল, সামান্য অনুমোদন। এটার অনুমোদন ছিল, কিন্তু নির্দেশ বা বাধ্যতামূলক ছিল না। এটার শুধুই অনুমতি ছিল। এরপর, আল্লাহ সূরা হাজ্জ এর ৩৯ নং আয়াত নাযিল করেন :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿39﴾

যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (সূরা আল-হাজ্জ-৩৯)
তার মানে, আপনারা দেখছেন, তাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

এখন, এর পরের ধাপ, যেমনটা ইবন কায়্যিম রহ. বলেন, এখন তাদের নির্দেশ দেওয়া হল যে যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। এটা ছিল তৃতীয় ধাপ। এবং এর আয়াত হচ্ছে,
সূরা বাকারার ১৯০ নম্বর আয়াত: আল্লাহ আয ওয়া-জাল বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿190﴾

আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা-১৯০)

এখানে অনুমতি প্রদান করা হল যে, তোমরা তাদের সাথেই যুদ্ধ কর যারা তোমার সাথে যুদ্ধ করে।
এবং এরপর চূড়ান্ত ধাপ এবং এটা হচ্ছে সেই ধাপ যা আল্লাহ আয ওয়া-জাল্লাহর চুড়ান্ত আইন চিত্রিত করে যা উম্মাহর উপর প্রযুক্ত হয়, যেমনটা ইবনে কায়্যিম বলেন, এবং তারপর আল্লাহর রাসুল সকল অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশপ্রাপ্ত হন।
আল্লাহ আয ওয়া-জাল বলেন,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿36﴾

নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আত-তাওবা – ৩৬)

এবং এটা হচ্ছে একটা হাদিস যেটা হচ্ছে মুতাওয়াতির। এটা আল-বুখারী, মুসলিম এবং অন্যদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে এবং রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২০ জনেরও বেশি সাহাবী দ্বারা বর্ণিত।

আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল, যাতে সালাত কায়েম হয়, যাকাত দান করা হয়। যদি তারা তা করে তবে তাদের রক্ত ও তাদের সম্পদ রক্ষা করল এবং আল্লাহ তাদের কাজের জন্য তাদের দায়ী করবেন।

তাহলে এগুলো হচ্ছে চারটি ধাপ যা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অতিক্রম করে।

### এর উদ্দেশ্য কি ছিল? কেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ করছিলেন?

কুরআনের কিছু আয়াত আমাদের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর উদ্দেশ্যগুলো বলে।

#### প্রথমটা হচ্ছে ইসলামের প্রমোশন।

আল্লাহ আয ওয়া-জাল বলেন

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿39﴾

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (সূরা আল-আনফাল – ৩৯)

২য় উদ্দেশ্য: ধর্মানুষ্ঠান ও ইবাদতস্থানসমূহের হেফাযত।
আল্লাহ আযযা ওয়া যাল বলেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿39﴾

যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (সূরা আল-হাজ্জ–৩৯)

তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে কারণ তাদের সাথে অন্যায় করা হয়েছে আর আল্লাহ যথার্থই তাদের বিজয় দানে সক্ষম।

তারা হচ্ছে সেসব লোক যাদের কোন অধিকার ছাড়াই ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল কারণ তারা শুধু বলেছে যে, "আল্লাহ আমাদের প্রভু।"

আর এমনটা যদি না হত যে, আল্লাহ একদল দ্বারা অন্যদলকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে ধ্বংস হয়ে যেত আশ্রম, চার্চ, সিনেগগ এবং মসজিদ যেগুলোতে আল্লাহর নাম অনেক বেশি স্মরণ করা হয়।

এবং আল্লাহ তাদের সমর্থন করেন যারা তাঁর সমর্থন করে। আল্লাহ যথার্থই শক্তিশালী এবং ক্ষমতায় মহিমান্বিত। এবং তাদের যদি আমরা ভূমির কর্তৃত্ব দিই তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সঠিক সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ নিষেধ করবে এবং সবকিছুর পরিণাম আল্লাহর হাতেই আছে।

তাহলে এখানে খেয়াল করুন, আল্লাহ আয ওয়া-জাল বলছেন, আল্লাহ মানুষকে প্রতিহত না করতেন, কখনো অন্যদের দ্বারা, তাহলে ধ্বংসপ্রাপ্ত আশ্রম, চার্চ, সিনেগগ এবং মসজিদ থাকত যেগুলোতে আল্লাহর নাম অনেক বেশি ব্যাক্ত করা হয়।

মানুষ যুদ্ধের দ্বারা প্রতিহত হয়, এটাকে সুন্নাত আল-মুদাফা বলে, এটা আল্লাহ আয ওয়া-জালের একটি আইন যা মানুষের জীবনকে শাসন করেছে।

যদি এই যুদ্ধ না হত তবে চার্চগুলো ধ্বংস হয়ে যেত, সিনেগগ ও মসজিদগুলো ধ্বংস হয়ে যেত।

এখন আপনি হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারেন, "চার্চ ও সিনেগগ কেন?"

আমরা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কথা বলছি। আমরাই প্রথম জাতি নই যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। প্রথম জাতি যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, তারা হচ্ছে বনী ঈসরাইল।

সালেহ নবী এবং তার অনুসারীদের জন্য আল্লাহর পথে যুদ্ধের কোন নির্দেশ ছিল না, হূদ নবী ও তাঁর অনুসারীদের, নুহ নবী ও তাঁর অনুসারীদের।

এই নবীগণের ক্ষেত্রে আল্লাহ আয ওয়া-জাল তাঁদের শত্রুদের কোন অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে ধ্বংস করে দিতেন। তাদের নিজেদের যুদ্ধে জড়ানোর দরকার হয়নি। মুসার অনুসারী, বনী ঈসরাইল জাতি ছিল প্রথম যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। তাদের জিহাদের উম্মত হওয়ার কারণেই সিনেগগ ও চার্চগুলো হেফাযতে ছিল। আর মসজিদও এখন হেফাযতে আছে কারণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতও এই ইবাদত করছে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথিবীকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করা।

তাই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বিকৃতি ঘটানোর কারণ না হয়ে বরং এটা হচ্ছে পৃথিবীর সুরক্ষার কারণ। এটি বিকৃতিকে প্রতিরোধ করে।

দেখেন আল্লাহর আয়াতগুলো ভূল ধারণাগুলো শুধরে দিচ্ছে, এগুলোকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে কারণ শয়তানের কারণে আমরা বাস্তবতাকে ভুল বুঝি।

সে আমাদের দিয়ে এভাবে চিন্তা করায় যে, ভাল হচ্ছে খারাপ আর খারাপ হচ্ছে ভাল। ঠকানোর সেই দক্ষতা তার আছে। মানে এটাই তার শয়তান হওয়ার কারণ, সে মানুষকে ঠকাবে এবং ভালকে খারাপ এবং খারাপকে ভাল হিসেবে উপস্থাপন করবে।

তাই কুরআনের আয়াতগুলো আমাদের মনে শয়তানের ফিসফিসানির কারণে তৈরি হওয়া বিকৃতিগুলোকে নাকচ করে দেয়।

কুরআনের আয়াতগুলো আমাদের অন্তরকে প্রচারমাধ্যম ও পৃথিবীর মিথ্যা কর্তৃত্বের কারণে সৃষ্টি হওয়া বিকৃতি থেকে পরিষ্কৃত করে।

তাই আল্লাহ আয ওয়া-জাল বলছেন যে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ জমিতে বিরাজমান বিকৃতিগুলোকে সীমিত করে।
আল্লাহ আয ওয়া-জাল বলেন (২:২৫১):

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿251﴾

তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালূতের বাহিনীকে

পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শিখালেন। আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়। (সূরা বাকারা – ২৫১)
এবং এটা যদি না হত যে আল্লাহ কিছু লোকদের অন্যদের দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিকৃত হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি দয়ালু।

চতুর্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটা মানবজাতির জন্য একটি পরীক্ষা, এটা একটা পরীক্ষা।

আমরা যেটা বলে আসছি যে, পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব আল্লাহ আয ওয়া-জালের পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা, আর তাঁর পথে যুদ্ধ হচ্ছে এই পরীক্ষার একটা অংশ।

আল্লাহ আয ওয়া-জাল বলেন, “এটা হচ্ছে হুকুম আর আল্লাহ যদি চাইতেন, তিনি নিজেই তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি সশস্ত্র যুদ্ধের হুকুম দেন তোমাদের কয়েকজনকে অন্যদের দ্বারা পরখ করার জন্য।”

তাই সশস্ত্র যুদ্ধ হচ্ছে বেঈমানদের জন্য পরীক্ষা। এটা ঈমানদারদের পরীক্ষা কারণ এটা তাদের ধৈর্য ও বিসর্জন পরীক্ষা করে।

চূড়ান্ত বিসর্জন যা একজন ঈমানদার আল্লাহ আয ওয়া-জালের জন্য করতে পারে তা হচ্ছে তার আত্মা ও সম্পদের বিসর্জন।

এটা হচ্ছে যাচাই করার পরীক্ষা যে তুমি আল্লাহ আয ওয়া-জালকে সৃষ্টির চেয়ে বেশি ভয় কর না সৃষ্টিকে আল্লাহ আয ওয়া-জালের চেয়ে বেশি ভয় কর।

তাই এটা হচ্ছে "আমল ক্বুলুব" বা অন্তরের আমলের একটি শক্ত পরীক্ষা। আমাদের অন্তরে হয়ত অনেক ব্যাধি আছে, কিন্তু এই ব্যাধিগুলো প্রকাশ পায় না যতক্ষণ না আমরা এই ইবাদতে শরীক হই।

তখন এই ব্যাধিগুলো উন্মোচিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ: অনেক মুনাফিকরা সমাজে অনেক ভালোভাবে মিশেছিল, তারা শুধুমাত্র বদর এবং উহুদের যুদ্ধে এবং পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে দৃষ্টিগোচর হয়।

এবং একারণেই আল্লাহ আয ওয়া-জাল তাদের সম্পর্কে বলেন, তারা কি দেখে না যে তারা প্রতিবছর দুএকবার পরীক্ষিত হয়? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বছরে গড়ে এক কি দুবার যুদ্ধ করতেন, তাই তাদের ভণ্ডামি প্রকাশ পাচ্ছিল এই যুদ্ধগুলোতে কারণ এটাই চূড়ান্ত পরীক্ষা।

৫ম উদ্দেশ্য: আল্লাহ আয ওয়া-জালের শত্রুদের শাস্তি দেওয়া এবং অপমানিত করা।
আল্লাহ আয ওয়া-জাল বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿60﴾

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। (সূরা আল-আনফাল – ৬০)

এটা ছিল সূরা আনফালের ৬০ নং আয়াত।
আল্লাহ আয ওয়া-জাল সূরা তাওবাহর ১৪ ও ১৫ নং আয়াতে বলেন,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿14﴾

যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। (সূরা আত-তাওবা – ১৪)

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿15﴾

এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আত-তাওবা – ১৪)

এবং সূরা আনফালের ১৭ ও ১৮ নং আয়াতে বলেন,

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿17﴾

মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের আমল বরবাদ হবে এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। (সূরা আত-তাওবা – ১৭)

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿18﴾

নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (সূরা আত-তাওবা – ১৮)

"এটা তো গেলো আর জেনে রাখ আল্লাহ নস্যাৎ করে দেবেন কাফেরদের সকল কলা কৌশল"

তারমানে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ কাফেরদের কলাকৌশল ভেস্তে দেবে। আয়াতের শুরুটা হচ্ছে, "সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত। এটাতো গেল, আর জেনে রেখো, আল্লাহ নস্যাৎ করে দেবেন কাফেরদের সমস্ত কলা-কৌশল।"

৬ষ্ঠ উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুনাফিকদের দৃষ্টিগোচর করা, আর আমরা এটা নিয়ে একটু কথা বলছি।
আল্লাহ আয ওয়া-জাল বলেন,

مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿179﴾

নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছ, আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদিগকে গায়বের সংবাদ দেবেন। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় রাসুল গণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর ওপর এবং তাঁর রাসুলগণের ওপর তোমরা প্রত্যয় স্থাপন কর। বস্তুতঃ তোমরা যদি বিশ্বাস ও পরহেযগারীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাক, তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে বিরাট প্রতিদান। (সূরা আল-ইমরান – ১৭৯)

"আল্লাহ বিশ্বাসীদের সেই অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না যে অবস্থায় তারা আছে, যতক্ষণ না তিনি খারাপকে ভাল হতে পৃথক করেন।" আর এই পৃথকীকরণ করার মাধ্যম হচ্ছে "কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর।"

উহুদের যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এক তৃতীয়াংশ বাহিনী নিয়ে পশ্চাদপসরন করেন, এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল করা হয়েছিল।

এটা হচ্ছে সূরা আলে ইমরানের ১৭৯ নং আয়াত।

৭ম উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর শত্রুদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরক্ষা যারা উম্মতের বিরুদ্ধে সীমালংঘনের পরিকল্পনা করে। তাই আল্লাহ আয ওয়া-জাল বলেন,

"আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা আন-নিসা–৮৪)

আল্লাহ আয ওয়া-জাল বলেন নি যে, দাওয়াহ কাফেরদের সামরিক শক্তি খর্ব করে দেবে।

তিনি বলেন নি যে, কথোপকথন ও বক্তৃতা কাফেরদের সামরিকশক্তি দুর্বল করে দেবে।

আল্লাহ আয ওয়া-জাল বলেছেন, কাফেরদের সামরিক শক্তি দুর্বল করার উপায় হচ্ছে যুদ্ধ।

যখন আল্লাহ বলেন যারা তোমাদের সাথে লড়াই করেছে তাদের সাথে লড়াই কর, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সময়কার লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন।

আমাদের বুঝতে হবে যে এই আয়াতগুলো এমন ঘটনার সাথে জড়িত যা ইতিহাসে ঘটে।

আমাদের সেখান থেকে শিখতে হবে।

ঠিক অন্যান্য ইতিহাসের বইগুলোতে লিপিবদ্ধ অমুসলিমদের দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধগুলোর মতই। ইতিহাসের এই বইগুলো পড়ে কেউ বলে না যে, ব্রিটিশরা বর্বর বা আমেরিকানরা বর্বর।

### কীভাবে মুনাফিকরা জিহাদের অর্থকে পাল্টাতে চাচ্ছে?

এক নম্বর: তারা বলে যে, জিহাদ হচ্ছে প্রতিরক্ষামূলক আর এটা আক্রমণাত্মক নয়।

দুই নম্বর: জিহাদ শুধু স্বাধীন মুসলিম দেশে অনুমোদিত।

তিন নম্বর: জিহাদ অবশ্যই আমীরের অনুমতি ও নির্দেশানুসারে করতে হবে।

ইহুদী ও ক্রুসেডারদের তাবেদার ও দালালরা বলে যে, জিহাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়েই শেষ হয়ে গেছে এবং অনেকে বলে যে আমাদের বর্তমান এই বিশ্বশান্তির দিনে, এই বিশ্বশান্তির সময়ে জিহাদ অনুপযুক্ত।

দুর্ভাগ্যবশত, আমরা দেখে আসছি যে, যুগে যুগে এসব উলামায়ে সু অর্থাৎ মুনাফিক আলেমরাই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ সম্পর্কে এসব ভুলতথ্য ছড়াচ্ছে।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অর্থ পাল্টিয়ে মানুষদের ঠকানোর ক্ষেত্রে যত ষড়যন্ত্রই থাকুক না কেন, উম্মতরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময় থেকে শিখে এসেছে জিহাদ মানে কি?

জিহাদের ওয়াজিবগুলো কি? সুন্নাহগুলো কি? জিহাদের নিয়মগুলো কি?

এগুলো আমরা কুরআন ও সুন্নায় পাব এবং সাহাবাদের (রা:) এবং ন্যায়নিষ্ঠ প্রজন্মের আমলেই পাব।

তাই আমাদের দরকার নেই যে আজকে কেউ এসে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে অর্থ ধার করে জিহাদের নতুন অর্থ ব্যাখ্যা করবে।

কারণ আমাদের ঐতিহ্যে যথেষ্ট তথ্য রয়েছে আমাদেরকে জিহাদের অর্থ শিখানোর জন্য।

আমাদের কারো সাথে এব্যাপারে পরামর্শ করতে হবে না কারণ এটা কুরআন, সুন্নায় এবং সাহাবাদের (রা:) আমলে পরিষ্কার।

মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ নিজের খারাপ প্রবৃত্তিকে হারিয়েছে, শয়তানকে হারিয়েছে এবং তাদের হারিয়েছে যারা তাকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে অনুৎসাহিত করে। আর এটা হল একটা মহান বিজয়।

মুনাফিকরা নিজেদের দুনিয়াবি মর্যাদার জন্যই মুসলিমদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, তাদের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ পালন করা উচিৎ নয়।

যেহেতু তাদের উচ্চমর্যাদা আছে, যেহেতু তারা বিখ্যাত শাইখ বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সেহেতু তারাই সিংহভাগ মুসলিম যুবসমাজকে পশ্চাৎমুখী করে রাখছে, যারা আল্লাহ আয ওয়া-জালকে সেভাবে মেনে চলত যেভাবে আল্লাহ পছন্দ করেন।

দেখেন এই লোকগুলো কত বেশি গুনাহ স্তূপীকৃত করেছে।তারা যা করছে তা কাফেরদের স্বার্থে করছে।

তারা দাওয়াহ করছে কাফেরদের স্বার্থে।

তারা এটার জন্য অর্থপ্রাপ্ত হোক আর না হোক, ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর সাথে দেখা করুক আর না করুক, তাতে কোন যায় আসে না।

তুমি যা করছ তা যদি কাফেরদের কাজে আসে তবে তুমি তাদেরই একজন হয়ে গেছ।

তুমি এটা অর্থের জন্য কর আর বিনামূল্যেই কর; তুমি এটা তাদের সাথে মিলে কর আর একাই কর, কোন পার্থক্য নেই, শেষ ফলাফল একই।

জিহাদ শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এবং এই বিশ্বাসটা আমাদের আছে এবং এটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে (ইয়াকীন)।

কারণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল আমাদের এটা বলেছেন।
আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" (৫:৫৪)

আয়াতটি বলছে, "ইউজাহিদুন"। জাহিদুন হচ্ছে বর্তমান কাল, তারা জিহাদ করছে। মানে প্রতিবারই যখন আমরা এই আয়াতটি পড়ি কেউ না কেউ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করছে। এবং এটা একটা ইঙ্গিত যে জিহাদ বিচারের দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

পরবর্তী আয়াত "আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।" (৮:৩৯)

এই আয়াতে "ফিতনা" মানে কুফর। আয়াতে বলা হচ্ছে, তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না কুফর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আর আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিস থেকে জানি যে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত কুফরি অব্যাহত থাকবে।

অতএব জিহাদও শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, কারণ আমাদের জিহাদ করতে বলা হয়েছে যতদিন না আমরা কুফরি নিশ্চিহ্ন করে দেই। তাই যতদিন কুফরি থাকবে ততদিন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থাকবে।

এখন হাদিস বলে যে, জিহাদ শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে কিন্তু আসলে ঠিক শেষের আগ পর্যন্ত।

কারণ ঈসার (আ:) সময়ে জিহাদ শেষ হয়ে যাবে। কেন এটা ঈসার (আ:) সময়ে শেষ হবে?

কারণ ঈসা আ. কুফর নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর আর যুদ্ধ করবেন না।

তাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য শেষ এবং ঈসার (আ:) এর পর আর কোন জিহাদ নেই। কারণ আল্লাহ আয ওয়া-জাল মুমিনদের রুহ নিয়ে যাবেন এবং কী বাকি থাকবে? কাফের।

আরে ইয়াযুয মাযুযদের বিরুদ্ধে কোন জিহাদ নেই কারণ তাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন সামর্থ্য নেই আর তারা অলৌকিকভাবে ধ্বংস হবে।

তাই আমরা বলতে পারি যে শেষ জিহাদ হচ্ছে ঈসার (আ:) দাজ্জাল এবং অন্যান্য কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ যতক্ষণ না ইসলাম সবদিকে ছড়িয়ে পরে আর সকল কুফরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এটা হচ্ছে সর্বশেষ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

# কল্পনার দিনলিপি

মূল : মুইনুদ্দিন শামী
অনুবাদ : মাওলানা আজিজুর রহমান

আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া, তিনি আমাদেরকে মুসলিম বানিয়েছেন। অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত বানিয়েছেন।

হে আমাদের মালিক! আপনি আমাদেরকে যার উম্মত বানিয়েছেন তার পথে চলার তাওফিক দান করুন। শরীয়ত প্রতিষ্ঠার মুবারক মেহনত আমাদের হাত দ্বারা বাস্তবায়ন করুন। আপনার রাস্তায় আমাদেরকে শহিদ হিসেবে কবুল করুন এবং নবীগণ, সিদ্দিকগণ ও নেককারদের সাথে হাশর এর ব্যবস্থা করে দিন। আমীন।

দ্বীন ইসলামের দুশমন ট্রাম্প, আর ট্রাম্পের বন্ধু ইমরান-

ট্রাম্পের কিছু গুণাবলী দেখুন!

১. ধর্মীয়ভাবে সে ইহুদীবাদী খ্রিষ্টান।

২. সে নিজেই বলে - ইসরাইলের সবচেয়ে বড় সমর্থকরা হোয়াইট হাউজে বাস করে।

৩. বাইতুল মুকাদ্দাসকে (জেরুজালেমকে) ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা দিয়েছে।

৪. ইহুদী ও ইসরাইলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে নিজের মেয়েকে ইহুদীর কাছে বিয়ে দিয়েছে।

৫. বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু ও নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

৬. সে বলে "আমাদের 'উগ্রবাদী ইসলাম বা সন্ত্রাসবাদকে" পরাজিত করতে হবে।

৭. ইন্দো-মার্কিন কমিউনিটির সমাবেশে সে বলেছে, "আমাদের (ভারত-আমেরিকার) নিরাপত্তার জন্য বর্ডার সংরক্ষণ করতে হবে।

৮. উপড়ে উল্লেখিত সমাবেশে মোদি প্রশ্ন রেখেছে - "আমেরিকার ৯/১১ ও মুম্বাই এর ২৬/১১ হামলার পরিকল্পনা কোথায় হয়েছে? (পাকিস্তানে হয়েছে!)

৯. ঐ সমাবেশে ট্রাম্প মোদিকে Father Of India আখ্যা দিয়েছে। সে কাকে পিতা আখ্যা দিল?! RSS এর মত সন্ত্রাসী সংগঠনের গোলাম 'মোদি'কে?! এই RSS গান্ধিকে হত্যা করেছিলো।

এই হলো ট্রাম্পের কিছু কীর্তিকলাপ। সে যা করেছে এগুলো তার দশ ভাগের এক ভাগও নয়। তারপরও ইমরান খান বলে, "ট্রাম্প সাহেব অনেক মহৎ মানুষ। স্পষ্টভাষী। আমি তার বন্ধু।"

আর ট্রাম্পও ইমরান খানকে এমন শব্দে সম্বোধন করে। আর সামনাসামনি সাক্ষাতে তো বলেই দিয়েছে, "যদি তোমার পরবর্তী ইলেকশনে আমি হোয়াইটহাউজে থাকি - তবে তোমার হয়ে প্রচারণা চালাবো। এবার কী হলো! দুইয়ে দুইয়ে যেন কত?!!

## পাক-চীন বন্ধুত্ব

আল জাজিরা টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকারের সময় যখন সাংবাদিক প্রেসিডেন্ট আরেফ আলাভীর কাছে জিজ্ঞাসা করল 'আপনার চীনের সাথে ব্যবসার প্ল্যান ১৪৩ আরব ডলার। অর্থাৎ প্রায় ৬ খরব (দশ হাজার কোটি টাকায় এক খরব)। এটি সত্তর আরব রুপিয়া দ্বারা শুরু হয়েছিল। এই চীনই তো দশ হাজার তুর্কিস্তানের মুসলমানকে উত্তর চীনে বন্দি করে রেখেছে। তাদের উপর জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে। আপনি এ ব্যাপারে কি বলবেন? আরেফ আলভি বলল, "পাকিস্তান চীন সরকারের সাথে আছে। এই ধরণের গুজব তখন ছড়ানো হয়, যখন কোন দেশকে চাপে রাখতে ইচ্ছা করা হয়। আমাদের সরকারের পলিসি হলো এমন যদি কিছু চীনে হয়ে থাকে তাহলে তা চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আর আমরা চীনের উপর ভরসা রাখি তারা তাদের লোকজনকে ভালোভাবেই রাখবে।"

এই প্রশ্ন ইমরান খানকে করা হয়েছিলো। উত্তরে সে বলেছে, "আমি পাকিস্তানের বাইশ কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী। তাদের ব্যাপারেই আমাকে চিন্তাভাবনা করতে হবে। (অর্থাৎ চীনের

মুসলমানদের কোন দায়-দায়িত্ব আমার নেই)।

ধরে নিলাম এটা চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়। পাকিস্তান যখন কাশ্মীরের আওয়াজ উঠায় তখন প্রধান চারটি ইসলামী দেশের কোনটিই তাকে সমর্থন দেই নি। উপরন্তু ঠিক এই সময়ই সৌদি, আরব আমিরাত মোদিকে অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে কাশ্মীর ইস্যুকেও ইন্ডিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয় বলা যায়। আপনার কষ্টের তো বিষয় নয় এটি। তারপর এটাও মনে রাখবেন যে, এই সব কথা বলে চীনের সাথে মিলে মুসলমান হত্যায় কিন্তু আপনিও শরীক আছেন। যার সাথে যার মুহাব্বাত তার সাথে তার কেয়ামত।

## ন্যাটো কার্গো - কর্মসংস্থানের মাধ্যম

ভয়েস অব আমেরিকা রেডিওর একটি নিউজ রিপোর্টে বলা হয়েছে, যখন আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্তানে হামলা করেছে তখন পাকিস্তানের অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার মধ্যে একটি ছিলো 'ন্যাটো কার্গো'। প্রতিদিন কমপক্ষে চারশ কার্গো পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে প্রবেশ করত এবং ন্যাটো বাহিনীর সেনাক্যাম্পে পৌঁছত।

আপনারা জানেন - এই সব কার্গোতে ললিপপ, কুলফি ও বাচ্চাদের খাবার পাওয়া যেত না। যেসব জিনিস তাতে থাকত তার মধ্যে ছিল ছোট ছোট পার্টস আকারে ভাগ করা জঙ্গি হেলিকপ্টার, ড্রোন বিমান, গাড়ি, অস্ত্র -বারুদ, সেনাদের প্রয়োজনীয় জিনিস ও জ্বালানী। আর এটাও জানা কথা যে, এই সেনারা আফগানিস্তানে লুকোচুরি খেলতে আসেনি। বরং আফগান জনগনকে গণহত্যায় এই বাহিনী নিয়মিত অংশগ্রহণ করতো।

কুফফারদের নিচুতার স্তর চিন্তা করুন। বলা হচ্ছে এই কার্গোগুলো কামাই রোজগারের একটি সুযোগ ছিলো। এ খবর শুনে সাইয়্যিদ কুতুবের একটি ঘটনা মনে পড়ল। তাকে ফাঁসিতে ঝুলানোর জন্য যখন মঞ্চে নেয়া হলো। তখন জেলের মৌলভী চলে এসে বলল, "সাইয়্যিদ কালেমা পড়"। তিনি বললেন, "কোন কালেমা? আমাকে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে যে কালেমার অপরাধে সেই কালেমা? না তোমার রোজগারের ব্যবস্থা করেছে যে কালেমা সেই কালেমা?"

এদিকে আমাদের জেনারেল তো কার্গো প্রতি কমিশন নিত। রাষ্ট্রের কোষাগারের জন্য নয়, বরং নিজের পকেট ভরার জন্য। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'জেনারেল কিয়ানী'। তো উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবার কি আয় রোজগারের ব্যবস্থা হয়েছিলো?

## মুসলমান নয় ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের আড্ডা

ভিশন ২০৩০ উপস্থাপনকারী ধর্মনিরপেক্ষবাদী মুহাম্মদ বিন সালমান কিছুদিন পূর্বে মহিলাদের জন্য মাহরাম ছাড়া সৌদি প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। এখন মহিলারা বিশেষ করে পশ্চিমা মহিলারা মাহরাম ছাড়াই আনন্দ বিনোদন করতে পারবে। আমরা তো সেই ভিশনের আলোচনা করেছি, যেটি হলো উলঙ্গপনার ভিশন। এখানে খোলামেলা সমুদ্র সৈকত, নাইটক্লাব, মদ, নাচ ইত্যাদি আছে। হে আল্লাহ! ঐ কুলাঙ্গারের গর্দান আমাদের তলোয়ারের নিচে করে দেন - যে আমাদের নবীর পবিত্র শহরকে নাপাক বানিয়েছে।

## লাভ

কসুর ও ফয়সালাবাদে মাসুম ফুলগুলিকে মাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তারপর তাদের দুখিনী মায়েদেরকে টিভি চ্যানেলের সামনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে তারা তাদের সন্তানদের লাশ, অথবা কমপক্ষে তাদের হাড্ডি হলেও যেন দেয়া হয়, তার আবেদন জানিয়েছে।

এই হল বর্তমান অবস্থা। অনুভূতিহীনতা এই পর্যায়ে এসে নেমেছে। আর দাবি করছে সেক্স এডুকেশন এর দ্বারা অবস্থা ভালো হবে। এই চরিত্রহীন ও সামজিকতাহীন ব্যক্তিরা সমাধান করবে সমাজের সমস্যা? একে বলা হয় লাভ! exploitation!

## আত্মহত্যা...হারাম মৃত্যু!

আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজের জীবনকে কুরবান করে নিহত হওয়াকে ইস্তেশহাদি হামলা বলে। যেহেতু এই ধরণের হামলাকে কাফেররা ভয় পায়, এবং এই হামলার বিপরীতে তাদের সকল টেকনোলজি অচল, তাই এই ধরণের হামলার নাম আত্মঘাতী হামলা দিয়েছে।

মিডিয়াতে এমন অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যায়, যেখানে কোন একজন ব্যক্তি শত্রুর ক্ষতি করার জন্য এবং নিজের লোককে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবনকে জেনে বুঝে শেষ করে দেয়। পাকিস্তানের ৬৫ সালের যুদ্ধে চুন্ডা নামক স্থানের রণাঙ্গনে - পাকিস্তানি সেনাদের ভারতীয় ট্যাংকের নিচে শুয়ে নিজেকে উড়িয়ে দেয়া আর রাশেদ মিনহাসের প্লেন ফেলে দেয়াতো প্রসিদ্ধ ঘটনা। এখন এই একই কাজ মুজাহিদরা করলে আত্মহত্যা ফতোয়া দেওয়া হয়। যাতে করে ইসলামের অগ্রগতিকে থামিয়ে দেওয়া যায়।

এর জন্য বাতিলপন্থীরা কিছু দরবারি মোল্লাদের ভাড়া করেছে। তারাই এই হামলাকে নাজায়েয ফতোয়া দিয়েছে। (যদি এটা শরয়ী বিষয় হতো তাহলে আমি কথা বলতাম না, বলতাম এটা আমদের বিষয় নয়। কিন্তু ৬৫ তে জায়েয আর মুজাহিদরা করলে নাজায়েয? বাকি এই হামলা দ্বারা নিরপরাধ মুসলমান যদি মারা যায় তাহলে তা জায়েয হবে না)।

এখন দেখেন এইসব ব্যাপারে সবাই কথা বলে। এমনকি বিবিসির মত দ্বীনের দুশমন সংবাদমাধ্যমও কথা বলে। সম্প্রতি বিবিসির একটি রিপোর্ট শুনলাম। তাতে এক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ

মহিলা বলেছে - তার ছেলে মানসিক রোগের কারণে আত্মহত্যা করেছে। একজন বললো – “এমন কাহিনী প্রচার করবেন না, তাহলে মৌলভী সাহেবরা জানাজা পড়বে না”। ছেলের পিতা বলল, “মৌলভীর জানাজার কি দরকার? আমিই তার জানাজা পড়ব।”

এ ধরণের মানসিক রোগীদের চিকিৎসা জরুরী। বরং যদি একটি ইসলামী দেশ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ইসলামী সরকারের জন্য উচিৎ হলো এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া (যেমনিভাবে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই সমস্যা দিন দিন বাড়ছে)। কিন্তু এটা কেমন কথা যে, তোমাদের ছেলেরা আত্মহত্যা করবে, আর তোমরা এক্ষেত্রেও মৌলভীকে নিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দেবে - যে মৌলভি জানাজা পরতে চায় না। তারপর আবার এই রিপোর্টে এই ধরণের কাজকে সাধারণ কাজ বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটা হারাম কিছু না!! এই রিপোর্ট দ্বারা কিছু শিক্ষা অর্জন হয় -

১. কিছু দুনিয়ালোভী মৌলভীদেরকে এই মিডিয়াগুলো আত্মঘাতী হামলার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

২. আত্মহত্যা যদি মানসিক সমস্যার কারণে হয় তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য বিষয়, আর যদি ইসলামের জন্য হয় তাহলে এটা অগ্রহণযোগ্য।

৩. ইসলাম ছাড়া আর যা কিছু আছে; সেক্যুলারিজম, লিবারেলিজম, উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা, আত্মহত্যা, সব কিছুর দাওয়াত বৈধ, শুধু ইসলামের দাওয়াত অবৈধ।

### মধ্যপন্থা দৃষ্টিভঙ্গির হিরো।

করাচির এক কার্টুনিস্ট ও সাহিত্যিক ‘মহিলা সুপার হিরো’ নামে এক কমিক্স সিরিজ বের করা শুরু করেছে। যার নাম ‘ইধি বাবা’। সেই মহিলা বলছে, একটা কমিক্স এর কাজ হাতে এসেছিল। আমি চিন্তা করলাম, কমিক্সের মধ্যে হিরো ভিলেনকে মারে। এক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে কেন এই চিন্তা কেন দেয়া হবে যে, হক্কের জন্য প্রয়োজনে মারতে হবে? বরং এই চিন্তা দেয়া যায় কিনা যে - হক্কের জন্য বাঁচাতে হবে।

এই চিন্তা থেকে আমি ইধির ব্যক্তিত্বকে নির্বাচন করেছি। এটা নির্বাচনের একটি দিক। চিন্তা করুন এটা কেমন বুঝ যে, হকের জন্য মারা হবে না, শুধু বাঁচানো হবে। কল্পনা করুন, বাতিল আপনাকে মারছে আর আপনি নিজের লোকদেরকে কেবল মলম পট্টি লাগাচ্ছেন এবং বলছেন আমি Nonviolence এর প্রবক্তা। যদি প্রশ্ন করা হয় - কেন Nonviolence ও নম্রতার প্রবক্তা? তারা উত্তর দেয় - যাতে Violence না ছড়িয়ে যায়।

ভাই একজন খারাপ মানুষ একশ মানুষকে হত্যা করতে পারে এবং করছে। এখন তাকে যদি মারা হয় অথবা গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে এই সামান্য Violence দ্বারা শত মানুষ হত্যার Violence কি বন্ধ হবে না? দেখুন এমন দৃষ্টিভঙ্গি কে ছড়াচ্ছে? একজন মহিলা - যেকিনা সেক্যুলার। আর এর প্রচার কে করছে? বিবিসি ও এজাতীয় বিজাতি প্রচারমাধ্যম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাখো-কোটি মানুষ গণতন্ত্রের জন্যই জীবন দিয়েছিলো। এই পশ্চিমা প্রচারমাধ্যম যাদের গোলামি করে। তারা সেক্যুলারাজিমের নামে শুধু মুসলমান নয় বরং মানবতার গণহত্যার অপরাধী। (যদি nonviolent heroes এর দৃষ্টিভঙ্গি শুধু Violence কে রোধ করা হয় তাহলে এটা অবাস্তব প্রস্তাবনা। আর যদি এর দ্বারা জিহাদকে বন্ধ করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে এর দ্বারা জিহাদ বন্ধ হবে না।)

ডাও মেডিকেল কলেজে ‘পয়গামে পাকিস্তান’ নামে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রভাব:

প্রথমেই বলে দেই যদি পড়তে মনে না চায় - তাহলে পড়বেন না।

ডাও মেডিকেল কলেজ করাচির প্রসিদ্ধ একটি মেডিকেল কলেজ। অক্টোবর ২০০৯ এ ওখানে একটি স্টল ‘সাজানো’ হয়েছিল। স্টলটি ছিলো কনডম প্রচার সংক্রান্ত। স্টলের দোকানদার কন্ডমের স্টাইলের পোষাক পরা ছিলো। এবং কনডমের ‘ফাযায়েলের’ প্রেজেন্টেশন দিচ্ছিল। কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে বাধ্য করা হয়েছে ঐ স্টলে উপস্থিত হয়ে স্টলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে। ঐ স্টল থেকে উপস্থিত লোকজনকে ফ্রী কনডম দেয়া হয়েছে।

এখন বলুন এখানে কী সমস্যা? কিতাবে তো এর শরয়ী হুকুমও বয়ান করা হয়েছে। সুতরাং এভরেসন এড়ানোর জন্য এর ব্যবহারে কী সমস্যা। এটা তো ইসলামী গণতান্ত্রিক পাকিস্তান। এখানের সব সাদা কালো ভালো।

সমস্যা আসলে কনডমের ব্যবহারে নয় বরং এর মাধ্যমে যেনার প্রতি খোলামেলা আহবানের উপর। এটা কোথায় প্রচার করা হচ্ছে? এটা তো এমন জায়গায় বন্টন করা হচ্ছে, যেখানে অল্প বয়সী অবিবাহিত নারী পুরুষরা একসাথে আছে। এমন জায়গায় খোলাখুলিভাবে এমন জিনিসের প্রচার কী ফলাফল বয়ে আনে? বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ! পূর্বে তো সামাজিকভাবে বদনামের ভয় ছিলো। এখন তো সরকার এর নিরাপদ রাস্তা নিজেই দেখাচ্ছে। যে দেশের ২৫% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে, যেখানে লাখো মানুষ রুটির জন্য হাহাকার করে, সে দেশে রুটি বিলি না করে কনডম বিতরণ করছে!

সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলো দ্বারা খারাবির প্রচার হচ্ছে, এবং ভালো বিষয়ের ক্ষেত্রে বাঁধা হচ্ছে। তারপর আবার এই অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, আত্মমর্যাদাহীনতার বিরুদ্ধে যে লিখবে, বলবে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলবে, সে খারেজী, বাগি আরো কত কী! এটাকেই বলে পয়গামে পাকিস্তানের বিজয়!
জি, এইচ, কিউ এর মধ্যে লাপাত্তা ব্যক্তিদের জন্য সেল গঠন

বিষয়টা তো পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু পর্যালোচনা হওয়া দরকার।

### ৫ই জুলাই ২০১৯

দুখিনী আমেনা মাসউদ জানজুআ সাহেবার ডি জি আই এস পি আর আসিফ গফুরের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর সে এবিষয়টি প্রকাশ করেছে এবং টুইটও করেছে যে, চিফ অব আর্মি স্টাফের আদেশে জি এইচ কিউ এর মধ্যে লাপাত্তা ব্যক্তিদের জন্য একটি সেল গঠন করা হয়েছে। অনেক মানুষ এই সংবাদ শুনে খুশী হয়েছে। তারা মনে করেছে এর দ্বারা ঐসকল ব্যক্তিদের মুক্তির প্রক্রিয়া সহজ হবে। কিন্তু তারা এই টুইটের আসল বার্তা বুঝতে সক্ষম হয়নি।

পূর্বে লোকেরা দেখত কখনও এম আই আই বি এবং এফ আই ও এখানে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এই সেল আসলে পূর্বে থেকেই ছিলো। আসিফ গফুর যেই সেলের কথা বলে, বাজওয়ার আদেশে যেই সেল গঠন করা হয়েছে এই সেল হলো সেই সেল। অর্থাৎ জি এইচ কিউ ওরফ পিন্ডিওয়ালারা এখন লোকদেরকে সরাসরি লাপাত্তা করে দিবে।

আবার সেলের আরো একটি অর্থও আছে, সেল পরিচালনা কামরাকেও এমনটা বলা হয়। তবে সেনাবাহিনী স্পষ্ট বলছে যে, লাপাত্তা ব্যক্তিদের জন্য একটি সেল-জি এইচ কিউ তেও আছে।

### ভাই রেলগাড়ি চালাও..এটম বোমা নেই।

অন্য কোন উপাধি সম্ভবত আর বাকি নেই। সে বিয়ে করেনি। এজন্য জাতির পিতা হতে পারেনি। তাই তাকে বলা হয়েছে পাকিস্তানের ছেলে। জী, শায়খ রশীদের আলোচনা করছি। সে ভারতকে হুমকি দিয়ে বলেছে, আমাদের কাছে এক পোয়া, আধা পোয়া এটম বোমা আছে। আমাদের কাছে ইঞ্চি ইঞ্চি, আধা ইঞ্চি, পৌনে ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি বোমাও আছে। শায়খ রশীদের জন্ম হলো বাজারে, তারপর সেখানেই নেংটি কাচা দিয়ে খেলে বেড়াত। মাঝে মাঝে পাশের গোয়ালা থেকে এক পোয়া, আধা পোয়া দুধ দই কিনে খেত। সরকারি পানির নলও দেখেছে এক ইঞ্চি, আধা ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি। তার দৌড় এপর্যন্তই। এজন্য এটম বোমাকেও সের কেজি ও ইঞ্চি দ্বারা পরিমাপ করছে। এবং হুমকি দিচ্ছে। ভাই তুমি রেলগাড়ি চালাও এটাই অনেক বড় কাজ। এটম বোম বন্ধক রাখ।

### জিহাদ আমাদের জীবনের লক্ষ্য।

জিহাদের কবি, আল্লাহর রাস্তার শহিদ মাকসুদুজ্জামান শহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন - আমাদের জীবনের লক্ষ্য হলো জিহাদ।

সুতরাং যাকে আল্লাহ তাআলা এই রাস্তার মজা ও বুঝ দান করেছেন - সে ভালো করেই জানে যে, প্রত্যেক জিহাদির জন্য জীবনের উদ্দেশ্য হলো জিহাদ। এই রাস্তা থেকে সরে যাওয়া বা সরানো জন্য কাছে মৃত্যুর সমান মনে হয়। এজন্য তো এই সমস্ত পাগলেরা গুলি, বোমা, আগুন, ড্রিল মেশিনের দ্বারা ছিদ্র করা, খাবারে শিশা, আরো বড় কথা হলো মা, বাপ, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তানদের পর্যন্ত এই রাস্তায় শহিদ হয়ে যাওয়া বা বন্দি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এই রাস্তা ছাড়ে না। এই রাস্তার মজা হলো মজলুমদেরকে জালেমের হাত থেকে বের করে ইনসাফের শীতল ছায়ায় নিয়ে আসা এবং জালেমদের মুখ ও ঘাড়ে তলোয়ার মারা। যেমনটি বদর, উহুদ. পেন্টাগন ও জি এইচ কিউ এর মধ্যে করা হয়েছে।

আলেমরা বলেছেন, জিহাদের সর্বোচ্চ স্তরের একটি স্তর হলো - কাফেরদেরকে রাগান্বিত করা।
আল্লাহ তাআলা বলেন

وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ

তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধ জন্মায়
এই আয়াতের তরজমা তাফসীর তো উলামায়ে কেরাম করেছেন। আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে কাফেরদেরকে রাগান্বিত করে এমন কিছু বিষয় তুলে ধরছি।

১. জিহাদপন্থীদের উপস্থিতিই কাফেরদের জন্য রাগের কারণ।

২. তাদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পরিকল্পনা ।

৩. কাফেরদের উপর মুজাহিদদের হামলা।

৪. মুজাহিদ কর্তৃক কাফেরদের গ্রেফতার করা।

৫. কাফেরদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের শক্ত অবস্থান এবং হকপন্থীদের পক্ষে কথা বলা।

৬. কাফেরদের বিপক্ষে, হকের পক্ষে মুজাহিদদের লেখনী।

৭. মুজাহিদদের এমন স্থানে পৌঁছে যাওয়া যেখানকার ব্যাপারে কাফের মুনাফিকদের ধারণা হলো, তাদের অনুমতি ছাড়া এখানে কেউ প্রবেশ করে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৮. মুজাহিদদের এমন স্থান থেকে আল্লাহর সাহায্যে বেরিয়ে যাওয়া যেখান থেকে একটি পিপড়া বের হলেও তাদের ক্যামেরায় ধরা পড়বে।

পদ্ধতিতো আরো অনেক আছে, আমি এখানে অল্প কয়েকটি লিখলাম। উদ্দেশ্য হলো – মুসলমানরা জেনে যেন অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। আর কাফের মুশরিকরা জ্বলবে, পুড়বে, রক্তক্ষরণ হবে, রাগে ফেটে পড়বে, আর তাদের অন্তর একটি জাহান্নামে পরিণত হবে।

নিঃসন্দেহে তিনিই আল্লাহ যিনি দুনিয়াতেই কাফেরদের অন্তরকে জাহান্নাম ও মুমিনের অন্তরকে জান্নাতে পরিণত করেছেন। হে আল্লাহ এর জন্য আমরা আপনার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

# শাইখ আলী আল খুদাইর-এর কিছু ফতোয়া

অনুবাদ: মাওলানা জাকির আহমাদ

এমন কোন কুফরি কি আছে যা কাউকে ইসলাম থেকে বাইরে নিয়ে যাবে?

**প্রশ্ন ১:** এমন কোন কুফরি কি আছে যা কাউকে ইসলাম থেকে বাইরে নিয়ে যায় এবং এমন কোন কুফরি কি আছে যা তা করে না? এবং সব কুফরগুলোই কি কুফর দুনা কুফর(যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না) যাদের ব্যতিক্রম হচ্ছে যদি এগুলো কুফর বলে বিশ্বাস করা, ইসতিহলাল(এদের হালাল ঘোষণা) বা জুহুদ(এগুলো হারাম মনে করতে অস্বীকার করা)?

**উত্তর: কুফর হচ্ছে দুই প্রকার:**

**১ম প্রকার:** যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়।
যেমন কোন প্রতিমাকে সিজদা করা অথবা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো বা অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে কুরবান/বলী দেওয়া, কুরআনের মুসহাফ ছিড়ে ফেলা, কাফেরদের সাথে মিত্রতা স্থাপন, তাদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা এবং জয়ী করা, মানব রচিত আইন প্রণয়ন, সালাত ত্যাগ করা(ইচ্ছাপূর্বক ও আলস্যবশত ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত) এবং এরূপ অন্যান্য কাজ। এইগুলো সবগুলোই বিশ্বাসের দিকটি বিবেচনা না করে শুধু আমলটিই একজনকে কাফেরে পরিণত করে।

এছাড়া এমন কিছু কুফরি কাজ রয়েছে যেগুলো জবানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন আল্লাহ বা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করা, দ্বীন বা এর স্পষ্ট প্রতীকগুলো নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা ইত্যাদিও কুফর।

আল্লাহ বলেন,

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿74﴾-

তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তুতঃ এরা যদি তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তবে তাদের কে আযাব দেবেন আল্লাহ তা'আলা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে। অতএব, বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী - সমর্থক নেই। (সূরা তাওবা ৯:৭৪)

**২য় প্রকার:** যেসব কুফরী ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। এই প্রকারের মধ্যে রয়েছে - অন্য কাউকে নিজ পিতা বলে পরিচয় দেওয়া, দুর্ভাগ্য হানলে কাপড় ছিড়ে ফেলা ও নিজ গালে চড় মারা, স্ত্রীর সাথে পায়ুপথে মিলন এবং এরূপ অন্যান্য কাজ। যেমনটা হাদিসে আছে,

"দুটি কাজ হচ্ছে কুফরের সমপরিমাণ: কারো বংশকে অপবাদ দেওয়া এবং মৃতের সম্পর্কে বিলাপ করা।"

আরেকটা হাদিসে আছে,

حديث أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

আবূ যার (রা:) থেকে বর্ণিত: আবূ যার (রা:) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছে, কোন ব্যক্তি জেনে শুনে অন্যকে পিতা বলে দাবী করলে সে কুফরী করল। এবং যে ব্যক্তি অন্য বংশের দিকে নিজেকে সম্বোধন করল সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (বুখারী পর্ব ৬১:/৫ হা: ৩৫০৮, মুসলিম ১/২৭ হা: ৬১)

এবং এই উক্তিটি যে "সব কুফরগুলোই কুফর দুনা কুফর যাদের ব্যতিক্রম হচ্ছে যদি এগুলো কুফর বলে বিশ্বাস করা, ইসতিহলাল বা জুহুদ", এটা হচ্ছে মুরজিয়াদের আকীদাহ ও উক্তি।

মানবরচিত আইন দ্বারা চালিত আইনব্যবস্থায় কাজ করার অনুমতি আছে কি?

প্রশ্ন ২: মুসলমানদের সাহায্য করা এবং তারা যদি তাওয়াক্বিতের প্রশ্নের সম্মুখীন হয় তবে তাদের রক্ষা করার অজুহাতে মানবরচিত আইন দ্বারা গঠিত জাহেলী আইনব্যবস্থায় কাজ করার অনুমতি আছে কি?

উত্তর: যদি আইনব্যবস্থা এমন হয় যা আল্লাহর আইনবিরোধী তবে এমন কাজ করা অনুমোদিত নয় ।

যদি সে জেনে ও স্বেচ্ছায় এমন আইন নিয়ে কাজ করে যা শরীয়াহবিরোধী, তবে এটা কুফরি, রিদ্দা এবং তাগুতে বিশ্বাস হবে। আল্লাহ আমাদের এসব থেকে হেফাযত করুন।
আল্লাহ বলেন:

لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿60﴾-

আপনি কি তাদেরকে(মুনাফিকদের) দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। (সূরা আন-নিসা ৪:৬০)

কিন্তু তারা যদি মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য তাদের আইনজীবী হিসেবে কাজ করে এবং কোন ধরনের কুফরি ও গুনাহে লিপ্ত না হয় এবং নির্দিষ্ট নিয়মের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে এবং সে পথ থেকে সরে না যায় তবে কোন আপত্তি নেই।

যেমনটা হাদিসে আছে,

"তোমাদের মধ্যে যেই নিজ ভাইকে সাহায্য করতে পার, তার তা করা উচিৎ।"

আল্লাহ বলেন,

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿7﴾-

"অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে"
(সূরা যিলযাল ৯৯:৭)

এবং হাদিসে আছে,

"একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের জন্য খুঁটি স্বরূপ"

এছাড়াও আরো হাদিস আছে। এসব থেকে বলা যায় যে, এটার অনুমোদন নেই, এবং প্রথমেই উত্তরে বলতে হয় প্রতিক্রিয়ার কথা, বরং তাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিৎ কেননা যখন সাহাবারা কুরাইশদের তাওয়াক্বিত দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিল তখন আল্লাহর রাসুল তাদের রক্ষার্থে কোন কুফরি বা রিদ্দার আশ্রয় নেননি, বরং তাদের ধৈর্য ধারণ করতে অথবা নিরাপদ স্থানে হিজরত করতে বলেছিলেন যতদিন না জিহাদের নির্দেশ বা সাহায্য এসেছে।

সংসদগুলো এবং এগুলোতে যারা প্রবেশ করে তাদের ব্যাপারে বিধান।

প্রশ্ন ৩: সংসদগুলোর ব্যাপারে বিধান কি এবং যারা এগুলোতে যারা প্রবেশ করে তাদের ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তর: সংসদগুলোর ব্যাপারে বিধান হচ্ছে এগুলোর ইসলামে অনুমতি নেই। এগুলো শিরক ও কুফরের জায়গা। আমরা এগুলোকে তাগুত হিসেবে দেখি কেননা এগুলো হচ্ছে আইন প্রণয়নের যায়গা। আল্লাহ হতে অবতীর্ণ আইন (শরীয়াহ) ব্যতীত অন্য ভাবে আইন তৈরির স্থান এগুলো।

আমরা জানি গণতন্ত্র ও সংসদগুলোর ভিত্তি হচ্ছে "মানুষের জন্য মানুষের বিচার"। আর মানুষই তাদের প্রতিনিধি দ্বারা এখানে আইন প্রণয়ন করে। এই প্রক্রিয়া বিচার, আইন প্রণয়ন, আদেশ এবং নিষিদ্ধকরণে আল্লাহর একক অধিকারের খেলাফ।

আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿57﴾-

আপনি বলে দিনঃ আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা যে বস্তু শীঘ্রয় দাবী করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (সূরা আল আন'আম ৬:৫৭)

এবং আল্লাহ বলেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿50﴾-

তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?
(সূরা মায়েদাহ ৫:৫০)

এবং আল্লাহ বলেন,

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿26﴾

বলুন, তারা কতকাল অবস্থান করেছে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন। তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না। (সূরা কাহফ ১৮:২৬)

এটা সংসদ, মানুষ, কারও জন্যই নয়। আর যে বলে থাকে যে, গণতন্ত্র ও সংসদগুলোর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে শুরার (ইসলামী পরামর্শ) উপর, তাহলে এটি একটি মিথ্যা ও প্রতারণা। এটি মূর্খতা ও বিপথগামীতা।

এটা ইসলামী শুরার উপর স্থাপিত নয় বরং এর ভিত্তি হচ্ছে – মানুষের দ্বারা আইন প্রণয়ন। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, ঐসব বিষয়ের উপর নয় যেগুলো অনুমোদিত। বরং তারা শরীয়াহ বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য পরামর্শ করে। এটাই তাদের বাস্তবতা।

যারা এগুলোতে (সংসদ) প্রবেশ করে, তাদের ব্যাপারে কিছু কথা আছে:

১। যদি সে এগুলোতে প্রবেশ করে এবং মানবসৃষ্ট আইন প্রণয়ন করে যা শরীয়াহ বিরোধী অথবা শরীয়াহবিরোধী আইনের ব্যাপারে একমত বা সন্তুষ্ট থাকে বা এর পক্ষে ভোট দেয় তবে সে একটা মুশরিক ও কাফের। এবং সে মূর্খতা বা ভুল ব্যাখ্যা বা এটাকে লাভজনক বিবেচনা করার জন্য ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না।

আল্লাহ বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿21﴾

তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি ? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা আশ-শুরা ৪২:২১)

আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿57﴾

আপনি বলে দিনঃ আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা যে বস্তু শীঘ্রয় দাবী করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (সূরা আল আন'আম ৬:৫৭)

এবং আল্লাহ বলেন,

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿26﴾

বলুন, তারা কতকাল অবস্থান করেছে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন। তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না। (সূরা কাহফ ১৮:২৬)

২। যদি সে প্রবেশ করে এবং সংবিধান শরীয়াহবিরোধী সেটা জেনেও যদি সে এটাকে মেনে চলার শপথ করে, এটা কুফর এবং রিদ্দা, সে আন্তরিক থাকুক আর নাই থাকুক। এটা তার ও উম্মাহর জন্য লাভজনক হোক আর নাই হোক এটা কুফর। সে জেনে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এই কুফরি করেছে। এবং সে হচ্ছে তার মত যে আল-লাত বা আল-উজ্জাকে মেনে চলার শপথ নেয় অথবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কার কুরাইশদের আইনকে মেনে চলার শপথ নেয়।

৩। যদি সে সংবিধানকে মেনে চলার শপথ না নেয় অথবা শরীয়াহবিরোধী আইন প্রণয়ন করে না বা এতে অংশ নেয় না - কিন্তু একে প্রত্যাখ্যান করে এর বিরুদ্ধে ভোট দেয় - তবে সে ভ্রান্ত এবং বিপথে চালিত। সে পরিবর্তন ও সংশোধন আনতে এবং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখানো পথের বিরুদ্ধে গিয়েছে। যদিও সে দাওয়াহ এবং পরিবর্তন ও সংশোধন আনার জন্য বিপথ এবং শিরকের পথ বেছে নিয়েছে তবুও শুধুমাত্র একারণে তাকে কাফের বলা যাবে না।

আল্লাহ বলেন,

فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿32﴾

অতএব, এ আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্য প্রকাশের পরে (উদভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া? সুতরাং কোথায় ঘুরছ? (সূরা ইউনুস ১০:৩২)

আমরা এই বিষয়টি "আল জাম'উ ওয়া থাজরীদ ফী শারহ্ কিতাব আত-তাওহীদ" গ্রন্থে "তাওহীদের আহ্বান" অধ্যায়ের "সংসদে প্রবেশ" বিষয়ে আলোচনা করেছি। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার ছাড়া ব্যতিত অন্য নিয়মে দিয়ে যে শাসন করে, তার ব্যাপারে বিধান কি?

প্রশ্ন ৪: আল্লাহ যা নাযিল করেছেন (যেমন: শরীয়াহ) তার বাইরের অন্য নিয়মে যে শাসন করে তার ব্যাপারে শরীয়াহর বিধান কি এবং এটা কি উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় খেলাফতের মত ছোট কুফর নাকি এটা ইসলাম থেকে বের করে দেওয়ার মত কুফর। এই দুয়ের যেকোন এক অবস্থায় আমাদের জন্য এই শাসকদের সাথে কি করা ওয়াজিব?

উত্তর: যে শাসক আল্লাহর বিধান বহির্ভূত শাসন করে, সেটা

মানব রচিত আইন দিয়ে হোক আর প্রথা ও ঐতিহ্য দিয়ে হোক সে হচ্ছে কাফের মুশরিক। আল্লাহ বলেন,

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿26﴾

বলুন, তারা কতকাল অবস্থান করেছে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন। তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না। (সূরা কাহফ ১৮:২৬)

এবং আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿57﴾

আপনি বলে দিনঃ আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা যে বস্তু শীঘ্রয় দাবী করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (সূরা আল আন'আম ৬:৫৭)

ইজমা (ঐক্যমত্য) দিয়ে স্বীকৃত যে তাদের কুফর হচ্ছে বড় কুফর। এই ঐক্যমত ইবনে কাসীর এবং তার সমসাময়িক অন্যান্য আহলুস সুন্নাহ কর্তৃক বর্ণিত। আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿44﴾-

আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়েত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না, যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। (সূরা মায়েদাহ ৫:৪৪)

এবং আল্লাহ বলেন,

م تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿60﴾-

আপনি কি তাদেরকে(মুনাফিকদের) দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। (সূরা আন-নিসা ৪:৬০)

এবং আল্লাহ বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿21﴾-

তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা আশ-শুরা ৪২:২১)

এবং এটাই হচ্ছে এখনকার অবস্থা। আমরা তাদের দেখি যে তারা মানুষের মধ্যে মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার করছে এবং অনেক জায়গায় তারা এটাকে ভিন্ন নামে প্রয়োগ করছে। যাইহোক, আমরা বাস্তবতার দিকে এবং এই আইনগুলোর অর্থের দিকে দৃষ্টি দিব। এগুলোর প্রতারণা ও এগুলোকে দেওয়া নামের দিকে নয়।

বিচারপতির ক্ষেত্রে, যদি সে একটি একক ঘটনাকে নিজ ইচ্ছা এবং খেয়ালখুশিমত বিচার করে এবং মানব রচিত আইন, নিয়ম, ঐতিহ্য ও প্রথা দিয়ে নয় তবে এখানে এটা হচ্ছে ছোট কুফর, যেমনটা এই হাদিসে আছে,

"তিন জন বিচারপতি আছেন, দুই জন বিচারপতি আগুনে আছেন..." এরপর এখানে বলা হয়েছে একজন হচ্ছে মূর্খ বিচারপতি যে নিজ ইচ্ছানুসারে বিচার করে। এটা হচ্ছে হাদিসটির প্রাসঙ্গিক অংশ। (সুনানে বর্ণিত)

ইবন আবদুল বীর "আল তাহমীদ"-এ বলেন, এই উদাহরণটি হচ্ছে ইজমা মতে বড় গুনাহ এর মধ্যে অন্যতম এবং এটাই উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় রাষ্ট্রে ঘটেছিল।

## এই শাসকদের প্রতি আমাদের ওয়াজিব কি যাতে আমরা আল্লাহর সামনে ক্ষমাপ্রাপ্ত হতে পারি?

উত্তর: মানব রচিত আইন দ্বারা শাসিত তাগুতের আদালতে যেও না এবং ইবরাহিমের মিল্লাত (আদর্শ) অবলম্বন কর। যেটা হল:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿4﴾

তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের

মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইব্রাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেন আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

এবং এই আয়াত অনুসারে কাজ কর। আল্লাহ বলেন,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿94﴾-

"অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।" (সূরা হিজর ১৫:৯৪)
এবং আল্লাহ বলেন,

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿106﴾-

"আপনি পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।" (সূরা আল আন-আম ৬:১০৬)
এবং আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿1﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿2﴾-

"বলুন, হে কাফেরকূল, আমি ইবাদত করিনা, তোমরা যার এবাদত কর।" (সূরা কাফিরুন ১০৯:১-২)

তোমার অবশ্যই তাদের ঘৃণা করতে হবে এবং তাদের প্রতি শত্রুতা থাকতে হবে এবং তাদের প্রতি কোন ওয়ালা(বিশ্বস্ততা) থাকা যাবে না। আল্লাহ বলেন,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿22﴾

যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। (সূরা মুজাদালাহ ৫৮:২২)

সামর্থ্য অনুসারে তাদের সাথে জিহাদ কর এবং হিজরত ও তাদের থেকে আলাদা হওয়ার পর পাপাচার প্রতিরোধ কর। আল্লাহ বলেন -

ا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿73﴾

"হে নবী, কাফেরদের এবং মুনাফেকদের সাথে যুদ্ধ করুন, এবং তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা।" (সূরা আত-তাওবাহ ৯:৭৩)
তুমি যদি তা করতে না পার, তবে আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ কর। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের সাথে অস্ত্র ব্যতীত জিহাদ কর(যদি তুমি প্রথমটাতে অসমর্থ হও)।
আল্লাহ বলেন -

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿52﴾-

"অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন।" (সূরা আল ফুরকান ২৫:৫২)

## শাসন/বিচার এবং আইন প্রণয়নের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কোনটা বড় কুফর?

প্রশ্ন ৫: শরীয়াহ ব্যাতীত অন্য আইন দ্বারা শাসন ও শরীয়াহ ব্যতিত অন্য আইন প্রণয়নের ব্যাপারে বিধান এবং এদুটির মধ্যে পার্থক্য কি এবং এগুলো কি যা কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ঘটছে? কোনটি ছোট কুফর এবং কোনটি বড় কুফর? শরীয়াহ ব্যতীত আইন দ্বারা শাসন কি ইমান বাতিল করে, নাকি এটা ইমানের অপরিপূর্ণতা দান করে?

উত্তর: এদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শরীয়াহ বহির্ভূত আইন প্রণয়ন, শরীয়াহ বহির্ভূত আইন দ্বারা শাসনের চেয়ে অধিক স্পষ্ট। শরীয়াহ বহির্ভূত আইন দ্বারা শাসন ব্যাপকতর (অনেক বেশি দেখা যায়)।

যে শরীয়াহ বহির্ভূত আইন দ্বারা শাসন করছে সে হয়ত মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন করছে বা সে নিজের খেয়াল খুশী ও ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন করছে। কিন্তু আইন প্রণয়নের ব্যাপারে, এটা হচ্ছে কুফরে আকবার(বড় কুফর) - এবং এটার জন্য আর কোন বিবরণের প্রয়োজন নেই। এটা হচ্ছে কুফরে আকবার এবং এটা যে করছে তার আকীদার দিকে দৃষ্টিপাত করারও কোন দরকার নেই। আল্লাহ বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿21﴾-

তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি ? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা আশ-শুরা ৪২:২১)
এবং আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿121﴾-

যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গুনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে-যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। (সূরা আল-আন'আম ৬:১২১)

শরীয়াহ বহির্ভূত আইন দ্বারা শাসন\বিচার করার ব্যাপারে কিছু কথা আছে -

১. সে যদি একটি একক বিচারে নিজ খেয়াল খুশী ও ইচ্ছামত বিচার করে তাহলে এটা হল ছোট কুফর, যেমনটা বলা হয়েছে এই হাদিসে, "তিন জন বিচারপতি আছেন, দুই জন বিচারপতি আগুনে আছেন..."

এখানে বলা হয়েছে একজন হচ্ছে মূর্খ বিচারপতি যে নিজ ইচ্ছানুসারে বিচার করে। এটা হচ্ছে হাদিসটির প্রাসঙ্গিক অংশ। (সুনানে বর্ণিত)

যদি সে আইন প্রণয়ন দ্বারা, মানব রচিত আইন, নিয়ম-কানুন, প্রথা, ঐতিহ্য এবং অনুরূপ জিনিস দ্বারা শাসন করে যা শরীয়াবিরোধী - তবে এটা কুফরে আকবার।
আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿44﴾-

আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না, যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। (সূরা মায়েদাহ ৫:৪৪)

এবং আল্লাহ বলেন,

مْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿60﴾-

আপনি কি তাদেরকে(মুনাফিকদের) দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। (সূরা আন-নিসা ৪:৬০)

এবং আল্লাহ বলেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿31﴾-

তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। (সূরা আত-তাওবাহ ৯:৩১)

রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন যে, তারা (ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা) তাদের (রাবী ও সন্ন্যাসীদের) আনুগত্য করে এভাবে – যেটাকে এই রাবী ও সন্ন্যাসীরা হালাল ও হারাম নির্ধারণ করে – সেটা তারা মেনে চলে। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿121﴾-

যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে-যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। (সূরা আল-আন'আম ৬:১২১)

এখান থেকে কোনটা ছোট কুফর এবং কোনটা বড় কুফর?

উত্তর: শরীয়াহ বহির্ভূত আইন দ্বারা শাসনের ক্ষেত্রে কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এটা বড় কুফর যা একজনের ইমান নষ্ট করে দেয় এবং তাকে ইসলামের বাইরে নিয়ে যায় যদি সে মানব রচিত আইন, প্রথা, ঐতিহ্য ও প্রণীত আইন দ্বারা শাসন করে যেগুলো ইসলামের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

আর ইচ্ছা ও খেয়াল খুশীর দ্বারা বিচারের ব্যাপারে বলতে গেলে, এটা হচ্ছে ছোট কুফর যা তার ইমানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ যেমনটা এই হাদিসে আছে, "তিন জন বিচারপতি আছেন, দুই জন বিচারপতি আগুনে আছেন..." এখানে বলা হয়েছে একজন হচ্ছে মূর্খ বিচারপতি যে নিজ ইচ্ছানুসারে বিচার করে। এটা হচ্ছে হাদিসটির প্রাসঙ্গিক অংশ। (সুনানে বর্ণিত)

আর ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, এটা হচ্ছে বড় কুফর এবং এর জন্য কোন বিবরণের প্রয়োজন নেই।

শরীয়াহ বহির্ভূত আইন দ্বারা বিচার কি ইমান বাতিল করে দেয় নাকি এটা ইমানে অপরিপূর্ণ করে?

উত্তর: শরীয়াহ বহির্ভূত আইন দ্বারা শাসন/বিচারের ক্ষেত্রে কিছু ব্যাপার আছে, কিছু আছে যা ইমান বাতিল করে দেয় এবং ইসলাম থেকে বের করে দেয় যেমন: মানব রচিত আইন, প্রথা, ঐতিহ্য বা প্রণীত আইন যা ইসলামের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সেগুলো দ্বারা বিচার করা। এবং খেয়াল খুশী ও ইচ্ছানুযায়ী বিচার করার ক্ষেত্রে, এটা হচ্ছে কুফরে আসগার (ছোট কুফর) যা একজনের ইমানকে ত্রুটিযুক্ত করে তোলে।

# উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. এর সাথে কিছুক্ষণ (পর্ব ০৫)

মুইনুদ্দিন শামী

অনুবাদ: মুহাম্মাদ আখতারুজ্জামান

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সকল প্রশংসা নিঃসন্দেহে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যই, যিনি আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরই আল্লাহ্। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাদের মরণ দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনি জীবন ও মরণ এজন্যই সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তিনি দেখে নিতে পারেন যে আমাদের মধ্যে থেকে কে উত্তম আমল করে?

নোট: উক্ত আলোচনায় যেখানেই 'উস্তাদ' বা 'উস্তাদজী' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ 'শহীদ আলেমে রব্বানী উস্তাদ আহমাদ ফারুক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

## তাদের দৃষ্টিতে মরণ সর্বনাশী নয়!

পূর্বের ওয়াদা অনুযায়ী আজকে উস্তাদজীর মজলিশে এমন কিছু শহীদদের ব্যাপারে আলোচনা হলো যারা উস্তাদজীর সাথী ছিলেন। ইয়েমেনে আল কায়েদার নায়েবে আমীর শহীদ শায়েখ সাঈদ আশ-শহরী (রহ.) শাহাদাত এবং শুহাদাদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

সে (শুহাদাদের কোন একজন) জান্নাতের মধ্যে অবস্থান করছে এখন তার একটা প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সে সাধারন একটা বিষয়ের জন্য খুবই চিন্তিত। সে তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য বলতে আরম্ভ করলো যে, এমন কেউ কি আছে? যে আমাদের বার্তাগুলোকে আমাদের ঐ সকল ভাইদের নিকট পৌঁছে দিবেন যারা দুনিয়াতে জীবিত আছে। যাতে করে তারা জিহাদের পথ থেকে দূরে না থেকে জিহাদ করতে করতে আমাদের সাথে মিলিত হয়ে যায়। তাদের কাছে আমাদের পয়গাম কে পৌঁছাবে? যারা আমাদের প্রিয় ও মহব্বতের পাত্র, যারা আমাদের সাথে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এর ভিত্তিতে একত্রিত হয়েছিল এবং একই সাথে জীবন অতিবাহিত করেছিল! কে আছে? যে তাদের নিকট আমাদের আকুতিকে নিবেদন করবে, যারা আমাদের সাথে দুশমনের খপ্পর থেকে বেঁচে পালিয়েছিলাম, একত্রিত হয়ে দুশমনকে আঘাত হেনেছিলাম শুধুমাত্র "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এর জন্য। এমন কে আছে? তাদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছাবে যে, আমরা জীবিত! জান্নাতের মাঝে যেখানে মন চায় সেখানে ঘোরাফেরা করতে পারি! আমাদের এমন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে কি? যারা আমাদের ভাইদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে খবর দিবে, তারা যেন জিহাদকে ছেড়ে না দেয়!।

মোটকথা যদি তোমরা জিহাদ ছেড়ে দাও এবং একাত্ববাদে বিশ্বাসী (তাওহীদের উপর বিশ্বাস রেখে অথবা আল্লাহর ইবাদকারী) হয়ে মৃত্যুবরণ করো, তবুও নিজের রূহ বা আত্মার সাথে কবর নামক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যেতে হবে। কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে, মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করতেই আমাদের নিকট জান্নাতে চলে আসুক। তাহলে তাদেরকে কে পয়গাম পৌঁছাবে?

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন: "আমিই তোমাদের এ পয়গামকে তাদের নিকট পৌঁছে দিবো" অতঃপর রব্বে কারীম এ আয়াত নাযিল করেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"এবং (হে নবী! স.) যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ স্বীয়

অনুগ্রহে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনো তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই।”
[সূরা: আলে ইমরান-১৬৯,১৭০]

## জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া পাওয়া হলো ‘শাহাদাত’!

শায়েখ সাঈদ আশ-শহরী (রহ.) -এর এ শব্দের তরঙ্গমালা দীলের গভীরে আন্দোলিত হয়ে উঠে এবং বিবেককে এ কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাসের মজবুত ইমারত বিনির্মাণ করে চলছে যে, মৃত্যুর সময় ‘শাহাদাতের পিয়ালা’ পান করা কত বড় জরুরী বিষয়। জীবনের বাস্তবতা, হাজারো পেরেশানী, প্রিয়জন ও নিকট আত্মীয়দের বিচ্ছেদে, এবং তাদের পাগলামী দেখে এমনটাই মনে হচ্ছে যে, এ জীবনে শাহাদাতের থেকে বড় কোনো ঔষধ নেই। একটুখানি সময় নিয়ে কবরের স্মৃতিচারণ করে দেখো তো- অন্ধকার, নির্জনতা, শ্মশানের মতো কবরস্থান। ঐ অন্ধকারের মধ্যেই মুনকার-নাকীরের মতো দু’জন ভয়ঙ্কর আকৃতির ফেরেস্তার আগমন, তারপর আবার কিয়ামতের কঠিন বিশৃঙ্খল অবস্থা যা দেখে বাচ্চারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, মা তার প্রিয় সন্তানকে ভুলে যাবে। এসব থেকে বাচার মূল্যবান পন্থা হলো শাহাদাত। যদি শুধুমাত্র এ সকল মুশকিল তথা কবর, হাশরের বিপদ থেকে শাহাদাতের দ্বারা পার পাওয়া যায় তাতেই বা কম কিসের? কিন্তু শাহাদাত তো অগণিত ও অতিরিক্ত প্রশান্তির কারণও বটে। কারোর যদি গুলশান বনানীতে সুউচ্চ ভবন থাকে, সুদর্শন বাগান এবং উন্নত ও দ্রুতগামী হাইব্রিড গাড়ি থাকে। এ সব কিছু থেকে আরশের নিকটস্থ সুশীতল কাননে আশ্রয় পাওয়া হাজারো লক্ষ কোটি গুণ উত্তম। সেখানে যেমন উন্নত ঘর, জান্নাতের শরাব, ঝর্নাতে অবগাহন এবং নয়নাভিরাম কুঞ্জনে ঘোরাফেরা আর বোরাকের মতো তেজদীপ্ত ও ক্ষিপ্র বাহন যেমন ঘোড়া। এখানেই ইতি নয়। এগুলো তো আধুনিক দুনিয়াতে জীবন যাপনকারীদের জন্য শুধুমাত্র উদাহারণ স্বরূপ। আল্লাহ্ তা’য়ালা এরশাদ করেন:

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“এবং জান্নাতে প্রত্যেক ঐ জিনিস পাওয়া যাবে, যা জান্নাতীদের অন্তরের চাহিদা হবে এবং যার দ্বারা চক্ষুসমূহ শীতলতা অনুভব করবে, (তাদেরকে বলা হবে যে) তোমরা এ জান্নাতে চিরকাল অবস্থান করবে।” [সূরা: যুখরূফ-৭১] সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়ায় কত বড় প্রতিদান।

আমাদের সমাজে এ কথার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে যে, নিহত হওয়ার দ্বারা অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায় এবং নিহত হওয়াটাই অনেক বড় ক্ষতিকর বিষয়। কিন্তু এ রাস্তায় নিহত হওয়া, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া এমন একট প্রশান্তি ও তৃপ্তিকর বিষয়, যা না আছে দুনিয়ায় আর না আছে জান্নাতে। এ জন্যই তো শহীদ জান্নাতে গিয়েও শাহাদাতের পিয়ালার জন্য পুনরায় আকুতি জানাতে থাকে। আল্লাহ্ তা’য়ালা আমাদের কাউকে যেন, এ শাহাদাতের পিয়ালা থেকে বঞ্চিত না করেন। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকল নিকট আত্মীয়, প্রিয়জন, পিতা-মাতা এবং সন্তানদেরকে শাহাদাতের মরন দান করেন। আমিন- ইয়া রব্বাল আ’লামিন।

পূর্বের সংখ্যায় যে সকল শুহাদাদের উল্লেখ করা হয়েছিলো তার মধ্যে থেকে ধারাবাহিক ভাবে সাইয়্যেদ কাসেম হাশেমী, রাজা আব্দুর রাফী’ এবং আমজাদ আহমাদ ভাইদের শাহাদাতের আলোচনা করা হবে। শুহাদাদের মধ্য থেকে এ কয়েক জনের উল্লেখ করা কোন বিশেষত্বের কারণে নয়, বরং এদের কিছু স্মৃতি ও কথাগুলো এমন যে, যার উল্লেখ করা খুবই জরুরী। মোটকথাঃ এরা উস্তাদজী (রহ.) এর সুযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

## জিহাদের ময়দানে ছুটে চলা এক ছোট ভাই!

সায়্যেদ কাসেম হাশেমী রণাঙ্গনে ‘সাঈদ, এবং ‘সিদ্দীক’ নামে পরিচিত ছিলেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কাসেম হাশেমী ভাই লাহোরের জিন্দা দিলান এলাকার সাথে বেশ পরিচিত ছিলেন। তার সম্মানিত পিতা সায়্যেদ রাফী’ উদ্দিন হাশেমী সাহেব উর্দূ ভাষার স্বীকৃত সাহিত্যিক ছিলেন, শিক্ষক ছিলেন। তিনি আল্লামা ইকবালের জীবনীর উপর ডক্টরেট করেন এবং সাথে সাথে তিনি লেখনীর ময়দানেও কলম চালিয়েছেন অবিরাম গতিতে। সায়্যেদ কাসেম হাশেমী ভাইয়ের কানে যখন জিহাদের আওয়াজ ভেসে আসে এবং তিনি এ কথা বুঝতে পারলেন ঠিক তখনই রণাঙ্গনে ছুটে যান। আমার মুর্শিদ হযরত উসামা ইব্রাহীম গুরী (রহ.) কাসেম হাশেমী ভাই জিহাদের ময়দানে আসার পূর্বে তাকে খুব ভালোভাবে চিনতেন। তিনি বলেন- “আমরা কখনো কাসেম হাশেমী ভাইকে গভীরভাবে দেখিনি, বরং আমরা মনে করতাম যে, সে-তো অনেক ছোট। কিন্তু এই ছোট-ই সবার আগে জিহাদের জন্য বের হয়ে যায়”।

কাসেম ভাই জিহাদের ময়দানে পৌঁছে যুদ্ধের প্রাথমিক ট্রেনিং গ্রহণ করে, যাকে তা’সিসী তাদরীব বলা হয়ে থাকে। তিনি উক্ত ট্রেনিং গ্রহণের জন্য উত্তর ওয়াজিস্তান এলাকার আঙ্গুরাডা সংলগ্ন স্থান গিরলামাতে পৌঁছায়। ট্রেনিং সমাপ্তির পরে হযরত উস্তাদজী (রহ.) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আঙ্গুরাডার প্রধান মারকাযে অবস্থান নেন। ঐ সময় লেখকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নিরব প্রকৃতির স্বভাব, হাসি-খুশি মেজাজের লোক হওয়ায় কাসেম ভাই উপস্থিত সকল সাথীদের খিদমতে প্রচুর সময় ব্যয় করতেন অথবা কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। আঙ্গুরাডার মারকাযে উস্তাদজীর যে মাজমুয়া’ ছিলো তার পক্ষ থেকে আব্দুল হাসিব ভাই আমিরের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ভাই আব্দুল হাসিব দু’একবার কাসেম ভাইকে কাজের জন্য কোথাও পাঠান। ভাই কাসেম গিয়ে সে কাজ শেষ করেন এবং সেখানে অনেক কষ্ট-মুজাহাদাও করেছেন পরে আবার ফিরে এসেছেন। আব্দুল হাসিব ভাইয়ের মনে হলো যে, কাসেম ভাই কাজের প্রতি তেমন আগ্রহী নয়। তাই আব্দুল হাসিব ভাই বিষয়টিকে কাসেম ভাইয়ের ট্রেনিং এর উস্তাদ সাজিদ ভাইকে অবগত করেন, যখন দু’জনেই আঙ্গুরাডায় যান। সাজিদ ভাই আঙ্গুরাডা থেকে যখন গিরলামায়

ফিরে যান, তখন কাসেম ভাইকেও সাথে নিয়ে যান। পুনরায় যখন সাজিদ ভাই আঙ্গুরাডায় আসেন, তখনও কাসেম ভাই তার সাথেই ছিলেন। আব্দুল হাসিব ভাই কাসেম ভাই সম্পর্কে প্রথমবার আঙ্গুরাডায় এসে উৎফুল্লতার সাথে কাজ না করার বিষয়টি জানিয়েছেন, সে বিষয়টি যখন সাজিদ ভাই কাসেম ভাইকে জানালেন তখন উত্তরে কাসেম ভাই বললেন যে, আসলে বিষয়টি এমন নয় যে আমি কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে চাইনি। বরং আমি এমন মুজাহিদ হতে চাচ্ছিলাম যার সম্পর্কে সহিহ বুখারীতে নবী স. এবং বাণী এসেছে এভাবে যে, "সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখে। তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করেনা, যখন আমিরের পক্ষ থেকে কোন কিছু সংরক্ষণ বা পালনের জন্য আদেশ করে তখন তার হেফাযতে পুরোপুরি ভাবে লেগে যায়। যদি তাকে লশকর বা সৈন্যদের পিছনে থেকে হেফাযতের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন সে সৈন্যদের পিছনে থেকে তাদের সংরক্ষণের কাজে আঞ্জাম দিতে থাকে। যদি কোন মজলিশ বা অন্দর মহলে প্রবেশের অনুমতি চায় অনুমতি পায় না এবং কারোর জন্য সুপারিশ করলে তার সুপারিশকে গ্রহণ করা হয় না।" এ কারণে আমাকে আব্দুল হাসিব ভাই যেখানে পাঠাতেন সেখানে চলে যেতাম এবং বসে থাকতে বললে বসে থাকতাম।

এখানে এ কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কোন মুজাহিদ অগ্রগামী হয়ে জিহাদ এবং ক্বিতালের কাজে অংশগ্রহণের জন্য নিজেকে পেশ করলে সে কোন মন্দ কাজে পতিত হয়ে যায়। তবে হ্যা যদি রিয়া (লোক দেখানো) উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তো সকল ইবাদত-ই বরবাদ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আসলে এ ধরনের উৎফুল্লতা, অগ্রগামী হওয়াটা মুজাহিদের জন্য এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার এবং এটাও বলা হয়েছে যে, এ ধরনের উৎফুল্লতা ও অগ্রগামী হওয়া আল্লাহর নিকট প্রশংসার বিষয়।

তারপরে বাস্তবেও এটা দেখা যায়। কাসেম হাশেমী ভাইকে যেখানেই পাঠানো হতো, যে দলের জন্য তাশকীল করা হতো ততক্ষণাৎ পুরোদমে সেখানেই নিজের জিহাদকে অব্যাহত রাখতেন। কখনো মারকাযে থাকতেন আবার কখনো তিনি মুজাহিদদের মেহমান খানায় থালা-বাটি পরিষ্কার করতে থাকতেন, খানা পাকাতেন আবার তা পরিবেশন করতেন আবার কখনো কখনো বাজার করতেন। তাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি দলের জন্য তাশকীল করা হলো, সেখানে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা, সেগুলোকে সংরক্ষণ করা (ইনক্রিপ্ট করা/ডিক্রিপ্ট করা) এবং সেগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি কাজ গুলোকে তিনি অতি যত্নের সাথে সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতেন।

একদা এক ভাই কাউকে বললো যে, ইদানিং কাসেম ভাই কি করেন? জবাবে বলা হলো যে, 'মাসয়াব ভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন'। মাসয়াব ভাই আমাদের এমন এক প্রিয় সাথী ছিলেন, উস্তাদজীর মাহফিলে যার অবাদ চলাফেরা ছিলো। মাসয়াব ভাই গুণাবলী উস্তাদজীর মাজমুয়ায় এক উজ্জল নক্ষত্র ছিলেন। [টিকা থেকে সংগৃহীত > গত সংখ্যায় লেখক যে সকল শহীদদের আলোচনা করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন তার মধ্যে মাসয়াব ভাইও ছিলেন। তার আলোচনার সময় বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে- ইনশা আল্লাহ্]। মোটকথা মাসয়াব ভাই এবং তার পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্টতার সূত্র ধরে তার খান্দানের থেকে যারা শহীদদের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন তাদের জন্য কিছু লেখার জন্য মনের মধ্যে প্রবল আগ্রহ রয়েছে। মাসয়াব ভাইয়ের সম্মানিত পিতা ও দু'বোন জিহাদের জন্য হিজরত করেন, এবং তাদের বিবাহ জিহাদের ময়দানেই হয়েছে। এমনকি তার এক বোনের বিবাহ তিন তিনবার হয়েছে। মাসয়াব ভায়ের মোট চার বোন এবং পিতাজী শাহাদাতের পিয়ালা পান করে ধন্য হয়েছেন। প্রথমে হাফেজ সা'দ (খুর্রম হাফিজ), কাতাদাহ্ ভাই, হিশাম ভাই (আলী সালমান), রায়হান ভাই (আফফান গনী) শাহাদাত বরণ করেন। সুবহানাল্লাহ্! এ পরিবার থেকে ছয়জন শাহাদাতের মর্যাদা অর্জন করেন- আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের সকলের প্রতি রহমতের বারি বর্ষণ করেন। এবং আমাদের পরিবারকেও যেন আল্লাহ্ পাক আরশে আজীমের সাথে ঝুলে থাকার তাওফিক দান করেন- আমীন।

## জিহাদের ময়দানে কুরআনের প্রেমিক!

ভাই কাসেম হাশেমী প্রচুর পরিমাণে কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করতেন। তার এক জিম্মাদার সাথী বলেন যে, কাসেম ভাই আমার সাথেই বেশি সময় থাকতেন। অনেক সময় সফরের মাঝে যদি কোন সাথীর সাথে দেখা সাক্ষাৎ হতো এবং তার সাথে কথা বলার প্রয়োজন হতো, তখন যদি দু'চার মিনিটের বেশি সময় লেগে যেতো তাহলে কাসেম ভাই এক পাশে বসে গিয়ে পকেট থেকে কুরআনুল কারীমের একটা নুসখা বের করে তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেতেন।

এই জিম্মাদার সাথীই বলেন যে, কাসেম হাশেমী ভাইয়ের শাহাদাতের পর তার পরিচিত এক বুযুর্গ আনসারীর ঘরে গেলেন। তখন ঐ আনসারী সাথী জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমাদের এক সাথী ছিলো যে কি-না খুব বেশি তেলাওয়াত করতেন সে কোথায়? প্রথমে এ জিম্মাদার সাথীর তো বুঝে আসে নি যে আনসারী সাথী কি জিজ্ঞেস করছেন। কিন্তু পুনরায় স্মরণে আসলো যে, এখানে তো কাসেম হাশেমী ভাইয়ের যাতায়াত ছিলো!। সুবহানাল্লাহ্! কুরআনের কেমন প্রেমিক ছিলেন যে, তার পরিচয় বহনের জন্য এ কথা বলা হয় যে, "ঐ সাথী যে কি-না বেশি পরিমাণে কুরআনের তেলাওয়াত করতেন।"

## খোদা ভীতি ও সৎ-কাজের সাক্ষ্য!

ভাই কাসেম হাশেমীর সৎ কাজ ও তাক্বওয়ার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ক্বারী আব্দুল আযীয সাহেব শহীদের আহলিয়া জানান যে, কাসেম হাশেমী ভাই যখনই তাদের বাড়িতে আসতেন তখনই বাড়ির বৈঠক খানায় অবস্থান করতেন। যেহেতু ক্বারী আব্দুল আযীয সাহেবের কামরা এবং বৈঠক খানার মাঝে শুধুমাত্র একটি দেওয়ালের ব্যবধান ছিলো, তাই পাশের ঘরের অবস্থা সহজেই

জানা যেত। ক্বারী সাহেবের সম্মানিতা আহলিয়া বলেন যে, একবার আনুমানিক রাত দুইটার সময় অনুভূত হলো যে, পাশের ঘর থেকে নড়াচড়ার আওয়াজ ভেসে এসো। তার কিছুক্ষণ পরেই তেলাওয়াতে কুরআন এবং যিকির আযকারের আওয়াজ আসতে লাগলো। কাসেম হাশেমী ভাই এত রাতে উঠে তেলাওয়াতে কুরআন ও তাহাজ্জুদের মাঝে মশগুল হয়ে যেতেন।

### শুহাদার কাননে আনুগত্যশীল মুজাহিদ!

কাসেম হাশেমী ভাইয়ের সকল আমীর ও জিম্মাদার সাথীরা তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং এমন কোন মুজাহিদ সাথী খুজে পাওয়া যাবে না যে, কাসেম ভাইয়ের কাছ থেকে কোন কষ্ট পেয়েছেন। কাসেম ভাই ২০১২ ঈসায়ীতে ওয়াজিস্তানে মাহসুদ কওমের এলাকায় 'ছাপান্ন কামরায়' এক প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। ঈদুল ফিতরের দিন যখন পাকিস্তানী সেনাদের গুপ্তচরবৃত্তির সূত্র ধরে আমেরিকার ড্রোন বিমানের দ্বারা কিছু সাথীদেরকে নিশানা বানায়। ঐ বোম্বিংয়ে যারা শাহাদাতের অমীয় সুধা পানে ধন্য হন তার মধ্যে কাসেম হাশেমী ভাইও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং এ হামলাতেই আমাদের বন্ধুবর ও ভাই মুহাম্মাদ আসকারীও শাহাদাত বরণ করেন, যার আলোচনা শুরুর দিকের সংখ্যাতে উল্লেখ করা হয়েছে। আমেরিকার নিক্ষিপ্ত মিসাইলের একটা অংশ কাসেম হাশেমী ভাইয়ের টাকনুতে লাগলে বড় একটা রগ কেটে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসা করে মারকাযে নিয়ে যাওয়া হয়, কাসেম ভাইয়ের রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে এবং সে কারণে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে শাহাদাতের পিয়ালায় চুমুক দিয়ে শহীদি কাননে পৌঁছে যান। আল্লাহ্ তার প্রতি প্রশস্থ রহমতের বারিধারা বর্ষণ করেন।

### চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য!

যে ডাক্তারগণ উম্মাহর ক্ষতচিহ্নের চিকিৎসার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন, তারা কাসেম ভাইয়ের শাহাদাতের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, সে 'ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরযে আইন' থেকে বেখবর ছিলেন। একজন মুজাহিদকে যুদ্ধের ময়দানে শুধুমাত্র এ জন্যই জীবনের ইতি টানতে হচ্ছে যে, সামান্য যখমের জন্য 'প্রাথমিক চিকিৎসা' দেওয়ার মতো কোন ডাক্তারের ব্যবস্থা নেই।

**আমি তো খুজেফিরি শহরের চিকিৎসা বিদ্যার গুরুজন**
**ছটফটরত মুজাহিদের যখমে পট্টি বাধিবে যে জন!**

চিকিৎসক, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ঐ সকল স্থানে যাওয়া এবং তাদের ক্ষতস্থানে মলম লাগানোর ব্যবস্থা করা, যারা নিজেদের শিরার শেষ রক্ত ফোটাও নিংড়িয়ে দিয়ে উম্মাহর শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু এ সকল ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা দুনিয়াকে অর্জন করতে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রেখে চলছেন। এ কথাগুলো সমালোচনার জন্য বা বদ দোয়ার জন্যও নয় বরং এটা অন্তরের ব্যথা। আমরা প্রতিদিন আমাদের উম্মাহর বাচ্চা, বুড়া, মহিলা ও নওজোয়ান পুরুষ মুজাহিদদের শুধুমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ডাক্তারের অভাবে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে দেখতেছি। এ অভিযোগ আমার একার নয়। অথচ উম্মাহর লক্ষ লক্ষ তরতাজা জীবনের আত্মচিৎকার শোনা যায়। আফসোস! আফগানিস্তানে চলমান বিশ বছরের যুদ্ধে যে সকল চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সংখ্যা হাতে গোনার মতো। কিন্তু যে ডাক্তার আমাদের শহরগুলোতে দুনিয়া অর্জনের লক্ষে উপার্জন করতে করতে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন তাদের সরকারি চিকিৎসকদের সংখ্যা হয়তোবা জরিপ করার প্রয়োজন পড়বে এবং বেসরকারি সংখ্যা অগণিত। ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য খুবই প্রয়োজন হলো তারা যেন নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসহ ঐ সকল ময়দানে পৌঁছান এবং জীবন উৎসর্গকারী তাওহীদে বিশ্বাসী ভাইদের জীবন বাচান এবং তাদের জন্য আরো কর্তব্য হলো যে, তারা মুজাহিদের জীবনকে রক্ষা করে নিজের জীবনকে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের মুশকিল থেকে নিরাপত্তা লাভ করেন। এ সকল ডাক্তার/স্বাস্থ্যকর্মীরা নিশ্চিতভাবে মুজাহিদ এবং উম্মাহর নিপীড়িত ও আহত মুসলিমদেরকে অনেক কিছুই দিতে পারেন। কিন্তু এ খেদমত দেওয়ার বিনিময়ে সে ঈমানী ও অন্তরের দৌলতও পেতে পারেন, যে প্রশান্তি দুনিয়ার অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়।

জিহাদি কবি শায়েখ আহসান আজিজ (রহ.) একটি - 'মুজাহিদের প্রয়োজন হলো ডাক্তারের' পংতির দ্বারা শুরু করেছেন কিন্তু শেষ পংতি হলো 'ডাক্তারের প্রয়োজন হলো মুজাহিদের' কবিতাটি কি ছিলো। ডাক্তারের উপকারিতা ব্যাপক যেমন সে ক্ষতস্থানে মলম লাগাবে কেটে যাওয়া স্থানে সেলাই করবে, অন্তরের ব্যথা প্রশমিত ও হায়াতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

### ইলম পিপাসু শহীদ রাজা আব্দুর রাফী'/যাহেদ/আব্দুল ওয়াদুদ!

আমাদের আগের উস্তাদজীর মাহফিলে আলোচিত শুহাদা কাননের দ্বিতীয় শহীদ রাজা আব্দুর রাফী'। জিহাদের ময়দানে তাকে প্রথমে যাহেদ এবং শেষ দিকে আব্দুল ওয়াদুদ নামে সুপরিচিত ছিলেন। যাহেদ ভাই পাকিস্তানের মারগলা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত নগরী ইসলামাবাদের সাথে সম্পর্ক ছিলো। তিনি আর্মি মেডিক্যাল কলেজ রাওয়ালপিন্ডিতে লেখাপড়া করেন। এখানেই সুমহান জিহাদের আহ্বান শুনতে পান এবং নিজের পিপাসিত আত্মাকে জিহাদের সুশীতল পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করতে ২০০৯ ঈসায়ীতে ওয়াজিরিস্তানে গমন করেন। যাহেদ ভাই নিজের নামের মতোই যাহেদ তথা দুনিয়া বিমুখ ও আবেদ ছিলেন। নীরব প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং চিন্তা ফিকিরে ডুবে থাকতেন বরং চিন্তাবিদ ছিলেন। কিন্তু যখনই কেউ তাকে দেখতেন তো তিনি চিন্তাযুক্ত চেহারা নিয়ে ইস্পিত হেসে দিতেন। যাহেদ ভাই একজন উত্তম মীমাংসাকারী ও নসিহতকারী ছিলেন যার জন্য আমার অভিধানে সবচেয়ে উত্তম শব্দ হলো 'Counsellor' বা পরামর্শদাতা। যাহেদ ভাইকে যদি আপনার কথা শুনাতে থাকলে সে শুনতেই থাকতেন এবং আপনার সমাধান দিতে থাকতেন চাই তার যত কাজই পড়ে থাকুক।

শেখা এবং শেখানোর কাজে তার প্রচুর আকাঙ্ক্ষা ছিলো। সাথে সাথে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন। যাহেদ ভাইতো একটা সমুদ্র ছিলেন, যার গভীরতা অল্প সংখ্যক লোকই জানতেন। আমি নিজেও তার গভীরতা সম্পর্কে জানতাম না। তবে কিছু সাথী তাকে বলতে থাকতেন যে, নিজের মধ্যে লুকায়িত ভাণ্ডারের কিছু হলেও বের করেন। যে ইলম ও বিষয়ে তার গভীরতা ছিলো তিনি সর্বদা অন্যকে শিখানোর জন্য তৈরি ছিলেন। নমনীয়তা ও তাওয়াজু এতটাই ছিলো যে ছোট থেকে ছোটকেও শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে নিতেন। স্বয়ং আমি নিজেও এ কথার সাক্ষী যে, যাহেদ ভাই অনেকবার নিজের থেকে বয়সে ছোটদের সামনে বসে যেতেন এবং কয়েক দিন পর্যন্ত তার কাছে পড়তে থাকতেন। নিজে নিজে চেষ্টা করে তিনি আরবি ভাষা শিখেছেন, ইসলামী আইন ও ইসলামী আইনের মূলনীতি শেখার জন্য আলেম সাথীদের কাছে লেখা পড়া করতেন। এভাবে হাদিস ও তাফসীর বিষয়ের জ্ঞানও শিখতে ছিলেন বরং তা'লিমী তারতীব দ্বারা তিনি দরসে নিযামীর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সিলেবাস পড়েছেন। তাফসীরের বিষয়ে তিনি খুব চিন্তা ফিকির ও জযবার সাথে মুফতী মুহাম্মাদ শফী উসমানী সাহেবের 'মায়া'রিফুল কুরআন', সায়্যেদ কুতুব শহীদ রহ. এর তাফসীর 'ফি যিলালিল কুরআন' এবং 'তাফসীরে সায়'দী' পড়তেন। আত্মশুদ্ধির জন্য তিনি হযরত মাওলানা হাকিম আখতার সাহেবের মাওয়ায়েজ দ্বারা উপকার লাভ করতেন। আকিদার বিষয়ের কিছু ক্লাস তিনি মাওলানা ডাক্তার উবাইদুর রহমান আল মারাবিত (হাফিজাহুল্লাহ্) থেকে পড়েছেন। এমনকি তিনি কিছু সবক আমাদের শহীদ আযীয আলী ত্বরীক ভাইয়ের কাছ থেকে শিক্ষা করেছেন, আলী ত্বরীক ভাইয়ের সাথে তার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিলো এবং দু'জনে একই সাথে শাহাদাত বরণ করেন।

## নামে ও কাজে অভিন্ন ছিলেন ভাই যাহেদ!

নিজের অস্তিত্বের জন্য মোটেও চিন্তা করতেন না। যেমন নাম ছিলো যাহেদ, তেমনি খানা-পিনা, উঠা-বসা দেখে লোকেরা বলছিলেন যে সে তো সব কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী ছিলেন এবং ইবাদত গোজার ছিলেন। তিনি নিজের জীবনের বড় একটা সময় বিভিন্ন অবস্থায় অনেক সফর ও জিহাদের কাজে ব্যয় করেছেন কিন্তু ফরয সালাতের আগে পরের সুন্নাত এবং নফল সমূহের খুবই ইহতেমাম করতেন। সালাতুল ইশরাক্ব ও চাশতের মতো নফলেরও নিয়মিত পাবন্দ ছিলেন। আমি একটা দীর্ঘ সময় তার সাথে কাটিয়েছি যার মধ্যে তাহাজ্জুদের সালাত ছুটে গেছে এমন দিন খুবই নগন্য। কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত সহ সকল ভালো কাজ সমূহ এবং মাসনূন দুয়া'র নিয়মিত পাবন্দ ছিলেন। অধিকাংশ মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে এসতেখারা তথা আল্লাহর সাথে পরামর্শ করে আঞ্জাম দেওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। কুরআনের মধ্যে গভীর চিন্তা-ফিকিরের ক্ষেত্রেও তার ভিন্ন একটা শান ছিলো, তাফসীর এবং উলামাদের তত্তাবধানে সকল ইবাদত করতেন। কুরআনের যে আয়াতের মধ্যে তিনি চিন্তা-ফিকির করতেন নিজের প্রিয় মানুষের কাছে তার আলোচনা করতেন।

মাযহাব প্রীতি তাকে স্পর্শও করতে পারেনি। এর থেকে তিনি উর্ধ্বে থাকতেন। শুধুমাত্র দূরেই থাকতেন না বরং উপস্থিত সাথীদের মাঝেও এগুলোর সুযোগ দিতেন না। নিজে এবং অন্যান্য সাথীদের অবস্থা ইসলাহের জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের ক্ষেত্রে তিনি একজন আদর্শবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ভুলকে বন্ধ ও সংশোধন করতে খুবই তৎপর ছিলেন, কিন্তু যদি সংশোধন না হতো তাহলে তার উপর কোন গালমন্দ না করেই ঐ ভুলের দ্বারা যারা প্রভাবিত হতেন তাদেরকে সতর্ক করতেন। যাতে করে সর্বদা গলদ ব্যক্তির থেকে দূরে সরে থাকতে পারে।

## ধোঁকা না খাওয়া মু'মিন!

যাহেদ ভাই খুব সাদা-সিদে ছিলেন, কিন্তু তাকে ধোঁকা দেওয়া সহজ ছিলো না। বাস্তবে যদিও তিনি সাদা-সিদে ও অন্যের চালাকি অথবা নিজের ভালো ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন মুয়ামালায় ধোকার শিকার হতেন তবুও খুব দ্রুতই হাক্বিকত বা আসল অবস্থা জেনে ফেলতেন এবং তারপর নিশ্চুপভাবে আলাদা পথে গ্রহণ করতেন।

যে হাদিস শরীফ কাসেম হাশেমী ভাইয়ের আলোচনার মাঝে উল্লেখ করেছেন যাহেদ ভায়ের অবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে উক্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, "সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখে। তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করেনা, যখন আমিরের পক্ষ থেকে কোন কিছু সংরক্ষণ বা পালনের জন্য আদেশ করে তখন তার হেফাজতে পুরোপুরি ভাবে লেগে যায়। যদি তাকে লশকর বা সৈন্যদের পিছনে থেকে হেফাজতের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন সে সৈন্যদের পিছনে থেকে তাদের সংরক্ষণের কাজে আঞ্জাম দিতে থাকে। যদি কোন মজলিশ বা অন্দর মহলে প্রবেশের অনুমতি চাইলে অনুমতি পায় না এবং কারোর জন্য সুপারিশ করলে তার সুপারিশকে গ্রহণ করা হয় না।"

যাহেদ ভাই বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রেশিয়ান বিভাগে কাজ করতেন সাথে সাথে অন্যদের জিম্মাদারীও পালন করতেন। কিছুদিন পরে তিনি উস্তাদজীর মাজমুয়া এর অর্থ বিভাগের সদস্য নির্বাচিত হন। সেই উস্তাদজীর 'প্রচার সম্পাদক' এর দায়িত্বও পালন করতে থাকেন। মোটকথা যাহেদ ভাইয়ের দু'জন জিম্মাদার-ই তার পরিপূর্ণ দ্বীনদারী ও আমানতদারীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

## মুজাহিদের আত্মত্যাগ!

বাইতুল মালের ব্যাপারে এবং সেই সাথে মুজাহিদ সাথীদেরও খুবই খেয়াল রাখতেন। একদিন আমাকে বলছিলেন যে, 'আমাদের প্রিয় সাথীদেরকে মারকায থেকে যে মাসিক খরচ বাবদ টাকা দেওয়া হয়, তা দিয়ে কি সাথীরা চলতে পারেন? যদি আপনি অনুভব করেন যে, কম হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমার সংশ্লিষ্ট

জিম্মাদারের নিকট এ ব্যাপারে সুপারিশ করবো'। মারকায থেকে ঐ সময় প্রত্যেক সাথীর জন্য প্রতি মাসে অর্থ বিষয়ক জিম্মাদারের নিকট তিন হাজার রুপি দেওয়া হতো। চারশত সাথীর টাকা একত্রিত হতে হতে একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দাড়াতো, যার মাধ্যমে জীবনের অধিকাংশ প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হতো। কিন্তু যাহেদ ভাই মারকাযের বাজার করেন এমন এক সাথীকে বলে রাখলেন যে, আমাকে একা থাকতে দিন অর্থ্যাৎ সবার সাথে খানায় শরীক হবেন না। তিনি সাথীদের ফিকির করতেন কিন্তু নিজের অবস্থা এই ছিলো যে, অন্য সাথীদের মতো তিনিও তিন হাজার রুপি পেতেন। যাহেদ ভাই বাজার থেকে খানা কিনে খেতেন। যাহেদ ভাইয়ের একজন দফতরী সাথী তায়্যিব ভাই যার আসল নাম ওয়াক্কাস ছিলো, যিনি অধিকাংশ সময় যাহেদ ভাইয়ের কাছে আসা যাওয়া করতেন তিনি যাহেদ ভাইয়ের আমল সম্পর্কে বলেন, এটা বলা সম্ভব নয় যে, যাহেদ ভাই কীভাবে জীবন অতিবাহিত করতেছেন! তিন হাজার টাকাকে ত্রিশ দিনে ভাগ করলে প্রতিদিন একশত টাকা হয়, আবার প্রতিদিন তিন বেলা বা দু বেলায় একশত টাকায় বাজার থেকে কিনে খাওয়া কি সম্ভব? বিষয়টি এমন ছিলো না, সে প্রতিদিন সকালে চায়ের সাথে রুটি অথবা সস্তা বিস্কুট খেতেন। অনেক সময় দুপুরে খেতেন-ই না এবং সন্ধ্যার সময় সবচেয়ে সস্তা রেস্টুরেন্ট থেকে ছোলার ডাল অথবা কোন সবজি দিয়ে রুটি খেতেন। উপরে বর্ণিত ছোলার ডালের অবস্থা ছিলো যে, শুধু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করা ডাল এবং এমন কোন তরকারি যা রুগীদের জন্য প্রযোজ্য। একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যাহেদ ভাইয়ের খানার অবস্থা ছিলো এটাই। আমি নিজে যখন তার সাথে ছিলাম তখন আমার জন্য স্বাভাবিক খাবার আনতেন আর নিজে অধিকাংশ সময় ঐ ছোলার ডাল-ই নিয়ে আসতেন।

### টেকনোলজি সম্পর্কে মুজাহিদের অভিজ্ঞতা-

উস্তাদজীর সকল প্রকারের চিঠিপত্র প্রথমে যাহেদ ভাইয়ের কাছে আসতো। উস্তাদজী যেহেতু দূরে কোথাও থাকতেন এবং তার গোপনীয়তার বিষয়টিও অনুভব করতেন তাই প্রথমে কাগজে লিখে অথবা কোন পার্সেলের মাধ্যমে পাঠানো পত্রকে যাহেদ ভাই খুলতেন এবং স্ক্যানার দিয়ে উল্টিয়ে উস্তাদের নিকট পাঠাতেন। তারপরেও সকল কাজগুলো সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতেন। মনে পড়ে গেলো যে, উক্ত কাজের সাথে তার অধীনের মাজমুয়া'র উপস্থিত সাথীদেরকে ডাটা বা তথ্যগুলোকে একত্রিত করতে বলেন এবং নিজেও ইখলাসের সাথে খুজতে থাকেন। শুধুমাত্র দ্বীনি বিষয়-ই নয় বরং জিম্মাদার সাথীদের জন্য দ্বীনি বিষয়ের সাথে সাথে অর্থনৈতিক বিষয়েও বিশ্বস্ত হওয়া খুবই জরুরী। চিঠিপত্র ও ডাটাকে প্রতিদিন অতি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করতেন। এ জন্য বুঝে শুনে সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। যেহেতু বর্তমানে দুনিয়ার অধিকাংশ দাপ্তরিক কাজ 'কম্পিউটার' এর উপর নির্ভর করে এ জন্য তিনি কম্পিউটারের সিকিউরিটি ও ইনক্রিপশনের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং কোন নতুন কিছুর বিষয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে বা শিখে নিতেন। আর যদি কোন সমস্যা বা ক্ষতির চিহ্ন অনুভব করতেন তাহলে সাথে সাথে তা দূর করে নিতেন। আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট আশা রাখি যে, যখন উস্তাদ আহমাদ ফারুক ওয়াজিস্তানের জিহাদে ২০১২ ঈসায়ী থেকে ২০১৪ ঈসায়ী পর্যন্ত যে ফিতনা হয়েছিলো তার আলোচনার সময়ে যাহেদ ভাইয়ের কিছু কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করবো। ইংশা আল্লাহ্-

### আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টিই হোক জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য!

যাহেদ ভাইয়ের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিলো আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বদা চেষ্টা ফিকিরে লিপ্ত থাকা। সে চেষ্টার মাঝেই তার যৌবনকে জিহাদের ময়দানে ব্যয় করা, দুনিয়া বিমুখতা, ইবাদত ও ময়দানে অবস্থান করা ইত্যাদি। স্বীয় মাতৃভূমি থেকে হাজার মাইল দূরে থেকে নিজের পালনকর্তাকে রাজি করানোর জন্য কান্দাহারে অবস্থান করছিলেন। ২০১৫ ঈসায়ীর অক্টোবরের প্রথম দিকে আমেরিকা, পাকিস্তান ও আফগানী অপারেশনে যাহেদ ভাই শাহাদাত বরণ করেন এবং তার লাশও খুজে পাওয়া যায়নি। তার সাথে আরো দু ডজনেরও বেশি উন্নত ও মূল্যবান মুজাহিদ শাহাদাতের পিয়ালা মুখে নিয়ে সোজা জান্নাতে চলে যান।

যারা আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জিহাদের সফরে জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তাদের মধ্যে থেকে কয়েক জনের নাম এখনো স্মৃতিতে ভেসে বেড়ায়, তারা হলেন- মাওলানা মুফতী আবু মুহাম্মাদ ইশতিয়াক আ'জমী, মাওলানা ক্বারী আব্দুল আযীয, মৌলভী মুহাম্মাদ সা'দ (সুরাকা), কমান্ডার (সুহাইল) ত্বরিক বাঙ্গালী, (সাদ্দাম হুসাইন) ইয়াকুব বাঙ্গালী, আনওয়ার বাঙ্গালী, সিদ্দীক বাঙ্গালী, তুরাব, উস্তাদ বেলাল, ক্বারী তুফাইল, তাজ, মুয়াজ জাকরানী, সাজ্জাদ বেলুচ, ছবের বেলুচ, মৌলভী মুহাম্মাদী বেলুচ, আলী ত্বরিক গোন্ডল, মুহাম্মাদ যুহাইব (সালেহ), আম্মার টিপু (হুযাইফাহ্) আল্লাহ্ তাদের সকলের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

**হে বখীল! শক্তি ফিরে পাই যদি মাটিতে মিশে**
**তুমি কেন চেঁচিয়ে বেড়াও অলি-গলিতে?**

### আমজাদ আহমাদ ভাই!

এখন আমজাদ আহমাদ ভাই সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করবো। আমজাদ আহমাদ ভাই জিহাদের ময়দানে 'আরিফ' নামে পরিচিত ছিলেন আর আমি তাকে 'আরিফ বিল্লাহ্' বলে ডাকতাম। তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ২০১১ ঈসায়ীর মাঝামাঝিতে যখন আমি ক্বারী আব্দুল আযীয সাহেবের বাড়ির নিকটবর্তী এলাকায় 'কোরী কোট' (উত্তর ওয়াজিরিস্তান, পাকিস্তান) আমার মূল আবাসস্থল ছিলো যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। কোন একটা কাজের জন্য ক্বারী আব্দুল আযীয সাহেবের বাড়িতে গিয়ে তার বৈঠক খানায় আরিফ ভাইকে অবস্থান করতে দেখি। আরিফ ভাই বড়ই মহব্বতের সাথে আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। সেখানে যা দিয়ে সম্ভব তার দ্বারা মেহমানদারী করলেন। মেহমানদারীর জন্য যা দিয়েছিলেন তা স্মরণ নেই, কিন্তু মোটামুটি

মনে আছে। আরিফ ভাইয়ের সাথে বেশি কথাবার্তা হয়নি তারপর আমি উঠে নিজের মারকাযে চলে আসি। কিছুদিন বাদে আরিফ ভাইয়ের শুভেচ্ছা পত্র আসে। সামান্য কথাবার্তা হলো, আরিফ ভাই আমার হালত জিজ্ঞেস করলেন ও ভালোবাসা প্রকাশ এবং উপদেশের সম্পর্ক উক্ত আরিফ নামের মাধ্যমেই স্থাপন হলো। পুনরায় তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় 'মিরান শাহ্' এলাকায়। আমরা একসাথে হযরত উস্তাদজীর থেকে 'দাওরায়ে শরইয়্যাহ্' করি। আরিফ ভাই ও আমার অবস্থা সামান্য সময়ের ব্যবধানে এমন হয়ে যায় যেমন ফারুক ভাইয়ের সাথে দোস্তী ও ভালোবাসা 'বদর মানসূর' ভাইয়ের ছিলো। অনেক দাওরার মাঝে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং সংশোধনের জন্য অংশগ্রহণ করতেন। পরে দাওরার অন্যান্য সাথীরা বলতেন যে, আমাদের সাথে 'বদর মানসূর' ভাই দাওরায় অংশগ্রহণ করেছেন। সুতরাং আসল কথা হলো যে দাওরার মাঝে আরিফ ভাইয়ের মতো মূল্যবান সাথী অংশগ্রহণ করেছেন সেখানে আমিও শরীক ছিলাম। এ দাওরার শেষে উস্তাদজী যখন সাথীদেরকে তার মান ও কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে ক্রমবিন্যাস বা 'নম্বর' দিয়ে তার একটা তালিকা সাথীদের হাতে তুলে দেন, তার মধ্যে যার নাম প্রথমে ছিলো সে হলো আরিফ ভাই। আরিফ ভাই জিহাদের ময়দানে অংশ নেওয়ার পূর্বে 'ইসলামী জমইয়্যাতে ত্বলাবা' এর সম্মানিত সক্রিয় ব্যবস্থাপক ছিলেন। বরং তিনিই কাজকে সক্রিয় রাখতেন, তিনি অনেকগুলো কাজের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। তার চলাফেরা ছিলো করাচীতে। যারা জানেন তারা বুঝবেন যে, 'ইসলামী জমইয়্যাতে ত্বলাবা' এবং বিশেষ করে করাচীর মধ্যে এ সংগঠনের কোন ব্যবস্থাপক কত বড় উন্নত ও যোগ্যতা সম্পন্ন জিম্মাদার হতে পারেন। কিন্তু আরিফ ভাই এতটাই বিনয়ী ও নমনীয় ছিলেন যে, তার কোন কথা বা কাজের দ্বারা এটা কখনো প্রকাশ পায়নি। বরং জিহাদের ময়দানেও কত জিম্মাদারদের অধীনস্ত হয়ে কাজ করেছেন কিন্তু কখনো কোন কাজে গাফলতি বা অবহেলার নাম গন্ধও পাওয়া যায়নি।

### দাওয়াতে জিহাদের ময়দানে মুজাহিদ আরিফ ভাই!

আরিফ ভাই শত শত নওজোয়ানের জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে বিসর্জন দিতে দাওয়াত দিয়েছেন। তার দাওয়াতে দশটি কাফেলা জিহাদের অংশ হয়ে যায় এবং আল্লাহকে রাজি করতে শাহাদাতের জন্য গর্দান দিয়েছেন তা কি পরিমাণ আল্লাহই ভালো জানেন। আরিফ ভাই নীরব স্বভাবের লোক ছিলেন। চোখ থেকে মেধা ও চিন্তা ফিকির টপকে পড়তো। কথা বলার সময় সতর্কতার সাথে বলতেন। অন্য কাউকে চালানোর যোগ্যতা আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে যথেষ্ট পরিমাণ দিয়েছিলেন। পবিত্র শরীয়াতের উপর দৃঢ়ভাবে আমলের পাবন্দ ছিলো। আমি নিজে দেখেছি যে, শরীয়াতের এমন কিছু বিধান ও মাসয়ালা আমার উপস্থিতিতে উস্তাদজীকে জিজ্ঞেস করলেন যার উপর শরীয়ত সম্মতভাবে আমল করতেন না। কিন্তু সে সকল বিষয়ের উত্তর পাওয়ার পর থেকে শাহাদাত পর্যন্ত ঐ ভাবে আমল করতেন যেভাবে উস্তাদজী বলেছিলেন।

একটা কঠিন মূহুর্তে, সেই ফেতনার মধ্যে যার আলোচনা সামনে আসতেছে- ইংশা আল্লাহ্। তিনি মুজাহিদদেরকে বিভক্তির হাত থেকে বাচালেন। ঐক্য বজায় রেখে লড়াইয়ের পাবন্দ করতেন, আমিরের আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতেন, কথা ও কাজের মাধ্যমে ফেতনার মোকাবেলা করতেন। তারপরে সকল কৃতিত্ব এবং প্রসংশা ও ফলাফলকে আমিরদের উপর ন্যস্ত করতেন। তিনি সর্বদাই জাতিগত গর্বকে চূর্ণ করে দিতেন বরং জাতিগত গর্ব করার সুযোগ-ই দিতেন না।

### মুজাহিদ আরিফ ভাইয়ের দু'টি গুণ- বিনয় ও বিভক্তি থেকে বাচাঁনো!

যখন-ই আমি কোথাও আরিফ ভাইয়ের নাম শুনতাম অথবা আমার স্মৃতিতে তার অবয়ব ভেসে উঠতো, তখন-ই আমার সামনে তার দুটি গুণ ভেসে উঠতো: ১। বিনয় ২। বিভক্তি থেকে বাচাঁনো। আরিফ ভাই সত্যিকারের আরিফ বিল্লাহ্ তথা আল্লাহর পরিচয় লাভকারী ছিলেন। তার মাঝে আরো অনেক উত্তম গুণাবলির সমাবেশ ছিলো, কিন্তু উল্লেখিত গুণ দু'টি আমার দৃষ্টিতে খুবই উত্তম ও উন্নততর ছিলো। তিনি ফেতনা বা ঝগড়ার কথাকে চেপে রাখতেন, গীবত থেকে দূরে থাকতেন। বরং কোথাও কোন গীবত বা পরনিন্দা হতে শুনলে গীবতকারীর সামনে তার চেহারায় অপমানের এমন ভাব ফুটিয়ে তুলতেন এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন যে, গীবতকারী অপমানিত হয়ে যেতো।

### অবশেষে সেই শাহাদাতের পিয়ালা!

আরিফ ভাই আল-কায়েদার বীর্রে সগীরের পক্ষ থেকে করাচীতে কয়েকটি কাজের সংশ্লিষ্টতায় জিম্মাদার ছিলেন। যখন গোয়েন্দাদের মধ্যে বিশেষ করে 'রও আনওয়ার' খুজতে গিয়ে আরিফ ভাইয়ের পিছনে অনুসন্ধান করে এবং তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ২০১৭ ঈসায়ীতে আইএস.আইএস.পি. 'রও আনওয়ার' আরিফ ভাইকে হ্যান্ডকাপ লাগানো অবস্থায় জেলখানার পুলিশ তাকে শহীদ করে দেয়। হত্যাকারী ভেবেছিলো, তার জীবনকে শেষ করে দিতে, কিন্তু মু'মিন বা বিশ্বাসীদের ভাগ্যতো এমন-ই হয়।

আজকে উস্তাদজীর মাহফিলকে আল্লামা ইকবালের এই তিনটি শের বা কবিতার দ্বারা শেষ করছি, তাহলো:

**দু'আলম থেকে ছিন্ন করে তারা দিলকে**
**প্রিয় বস্তু বানায় যারা মিলনের স্বাদকে,**
**শাহাদাত হলো মাকসাদে মু'মিন জীবনের**
**গনিমত নয়-তো, নয়-তো দেশ দখলের**
**দিলের প্রমোদ বুঝে নেয় সে উহাকে (শাহাদাতকে)**
**ধ্বংস নয় তো মরণ মু'মিনের নজরে!**

[চলবে- ইনশা আল্লাহ্]

# আমাদের নাগরিকতা




## আল কায়েদা ইরাক শাখার শুরা কমিটির একটি বিবৃতি

(লেখাটি আত-তিবইয়ান পাবলিকেশন থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। মূল শিরোনাম ছিল - Islam is our citizenship। আল কায়েদের ইরাক শাখার শুরা কমিটির একটি বিবৃতি এটি। বর্তমানে আল কায়েদার ইরাক শাখা বিলুপ্ত।)

**পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।**

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি মুমিনদের রক্ষাকর্তা ও পথপ্রদর্শক এবং যিনি কাফির, মুরতাদ ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ তাওহীদের অনুসারীদেরকে সাহায্য করে থাকেন। সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার ও সাহাবীদের উপর এবং তাদের উপর যারা কিয়ামত পর্যন্ত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো পথে চলবে ও এই পথে অবিচল থাকবে।

অতঃপর, আমাদের প্রতি সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত রাব্বুল আলামিনের বিরাট একটা অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে একটি জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করে সম্মানিত করেছেন। আমাদের রব আমাদেরকে এমন এক নামে সংজ্ঞায়িত করেছেন যার দ্বারা মানুষদের মধ্যে যারা তাওহীদে বিশ্বাসী তারা কোন রকমের ব্যতিক্রম ছাড়াই একসাথে একটি জাতিতে পরিণত হয়।

শায়েখ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল লতিফ বলেন-"ইসলামে আসার পর বা ইসলাম গ্রহণ করার পর মানুষজন তোমাকে ইসলামের সাহায্যেই চিনবে, অন্যান্য অনেক ধর্মের মানুষদের মধ্যেও তোমাকে ইসলামের নামেই ডাকবে। নিশ্চয় এটা আমাদের রবের নিকট হতে একটি বিশাল অনুগ্রহ।"

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন-

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿78﴾

তোমরা আল্লাহর জন্যে শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রাসুল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা- আল হাজ্জ: ৭৮)

তাই যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এই নাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে এই নামেই পরিচিত করতে চান তাই এই নাম ত্যাগ করা বা এর পরিবর্তে অন্য কোন নাম গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই আমাদের আনুগত্য ও বৈরিতা হবে শুধুমাত্র এই (মুসলিম) পরিচয়ের ভিত্তিতে। অন্য কোন পরিচয়ের ভিত্তিতে আনুগত্য ও বৈরিতার সম্পর্কের কোন অনুমতি ইসলাম আমাদেরকে দেয় না।

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ বলেছেন-

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের। তিনি কোরআনে আমাদেরকে 'মুসলমান' 'মুমিন' ও 'ইবাদাল্লাহ' (আল্লাহর দাস) বলে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষদের মধ্যে একদল লোক আল্লাহ্ প্রদত্ত এই সকল নামের পরিবর্তে নিজেদের তৈরি কিছু নামের মাধ্যমে নিজেদের ও

নিজেদের পূর্বপুরুষদের পরিচয় প্রদান করে থাকে। এই সকল পরিচয়কে তারা তাদের আনুগত্য ও বৈরিতার মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে। আমরা আল্লাহ আমাদেরকে যে সকল পরিচয় দিয়েছেন তা বাদে অন্য সকল মনুষ্যনির্মিত পরিচয়কে অস্বীকার করি। নিশ্চয় আল্লার তা'আলার নিকট মর্যাদার মাপকাঠি হল তাকওয়া। যে যত বেশি তাকওয়াবান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার মর্যাদা তত বেশি। একজন মানুষ কোন জাতি বা গোত্র থেকে এসেছে তা রবের কাছে ধর্তব্য নয়।"[১]

উপড়ের আলোচনা ও প্রমাণাদি থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ যে সকল মূলনীতির উপর এই দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় মূলনীতি হচ্ছে-"আল্লাহর নিকট বান্দার মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে বান্দার তাকওয়া (খোদাভীতি)। যার তাকওয়া যত বেশি সে রবের নিকট তত বেশি মর্যাদাবান।" তাই দুনিয়ার বুকে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত করার পথে কাউকে কোন প্রকারের অনুগ্রহ করার সুযোগ নেই। এমনকি আল্লাহর আদেশ পালন করার পথে নবীদেরও কাউকে কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শনের অনুমতি ছিল না।

আল্লাহর রাসুলের জামানায় এক মহিলা চুরি করে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তো নিয়ম অনুযায়ী তার হাত কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সময় উসামা ইবন জায়েদ (রা:) সেই মহিলার পক্ষ হয়ে তার হাতটি যেন না কাটা হয় সে ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সুপারিশ করেন। উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন-"হে জায়েদ, তুমি কি আল্লাহর আদেশের বিপরীত কোন কিছু করার সুপারিশ করছো ? তবে শুনে রাখো যার হাতে মুহাম্মদের জীবন সেই সত্তার শপথ করে বলছি- যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা এই চুরিটি করতো তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" এ বিষয়ে আরও অনেকগুলো হাদিস রয়েছে।

সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল বর্তমানে আমরা এমন কিছু শায়েখদেরকে দেখতে পাই যারা নিজেদেরকে ইসলামী জ্ঞানের ধারক-বাহক এবং সুন্নাহের অনুসারী বলে দাবী করেন। আবার এই লোকগুলোই ক্রুসেডারদের সাহায্যকারী আর্মি ও পুলিশ বাহিনীর মুরতাদগুলোর রক্তের পবিত্রতা নিয়ে কথা বলে। তারা দাবী করে যে যেহেতু এই লোকগুলো (পুলিশ ও আর্মি) নামে মুসলমান তাই মুসলিম হয়ে তাদের রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ হবে না। অথচ এই মুরতাদেরা তাওহীদের অনুসারীদের ও মুজাহিদিনদের বিপক্ষে কুফফারদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করে থাকে। এই সকল দরবারি আলেমরা তাদের দাবীর স্বপক্ষে কোরআন ও হাদিস থেকে কোন দলিল দেখাতে পারে না। তারা তাদের দাবীর পক্ষে একটাই যুক্তি দেখায় যে যেহেতু এই মুরতাদেরা 'ইরাকি' এবং তাদের গায়ের রক্ত 'ইরাকি রক্ত' তাই এই রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ হবে না।

তারা যে দাবিটি করে থাকে এর প্রতিফলন আমরা মুসলিমদের ইতিহাস তো দূরের কথা কুফফারদের ইতিহাসেও খুঁজে পাই না। আমরা দেখতে পাই যে পৃথিবীর যেকোনো দেশের সরকার সেই দেশের নাগরিক হয়ে দেশের শত্রুদের সাথে কোন ধরণের বন্ধুত্বের ব্যাপারে কোন ছাড় দেয় না। দেশের বিপক্ষে শত্রুদের সাথে যে কোন ধরণের মিত্রতার একমাত্র শাস্তি ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা। প্রায় সবগুলো দেশেই এই শাস্তি আইন করে পাশ করা আছে।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 'তিন ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করার ব্যাপারে আর কোন বাঁধা থাকে না। কারণগুলো হল-

১. যদি সে বিবাহিত যিনাকারি হয়।
২. যদি সে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।
৩. যদি সে ইসলাম গ্রহণের পর আবার এই ধর্ম থেকে বেরিয়ে যায়।

এই তিন পরিস্থিতি বাদে আর কোন ক্ষেত্রে মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ নয়।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই তিন পরিস্থিতি ব্যতীত বাকি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুসলিমের রক্তের পবিত্রতার নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। মুসলিমের রক্তের পবিত্রতার নিশ্চয়তা দিতে যেয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও একথা বলেননি যে শুধুমাত্র ইরাকি হলেই তার রক্ত প্রবাহিত করা হারাম হয়ে যাবে। অথবা তিনি একথাও বলেন নি যে অমুক গোত্র বা অমুক জাতি হলে তার রক্ত প্রবাহিত করা যাবে না।

তাই একজন বিবাহিত ব্যক্তি যদি যিনা করে থাকে তবে পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করতে হবে যদিও সে ইরাকি হয়। একজন ব্যক্তি যদি শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে উপযুক্ত কোন কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করে থাকে তবে বদলা হিসেবে তাকেও হত্যা করা হবে যদিও সে ইরাকি হয়। আর একজন যদি ইসলাম গ্রহণের পর আবার এই দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় তবে সে যে দেশের নাগরিকই হোক না কেন তার রক্ত অন্যদের জন্য হালাল হয়ে যাবে।

ইসলামে দেশ বা গোত্রের কারণে বিশেষ ধরণের কোন সুবিধা পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। আর দেশের নামে মুসলিমদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করার এই নিয়মনীতিও ইসলাম সমর্থন করে না। একজন ব্যক্তি ইরাকি বা গায়রে ইরাকি যাই হোক না কেন মুসলিম হলে সবার জন্য একই নিয়ম আপতিত হবে।

আমাদের মুসলিমদের জন্য কোন মাপকাঠিতে কারও সাথে বন্ধুত্ব করবো এবং কার সাথে শত্রুতা পোষণ করবো সে ব্যাপারে স্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত মাপকাঠি ব্যতীত যা কিছুই আমরা মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করবো তাই জাহিলিয়্যাতের মাপকাঠি বলে গণ্য হবে। আল্লাহর মাপকাঠি ব্যতীত অন্য যে সকল মনুষ্য নির্মিত মাপকাঠি বন্ধুত্ব ও শত্রুতার জন্য ব্যবহার করা হয় তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

এ কারণেই একজন আমেরিকান মুসলিম যে কিনা আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসুল তার জন্য যা কিছুর আদেশ করেছেন তার আনুগত্য করে এবং যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে এবং তাগুতকে অস্বীকার করে তবে সেই ব্যক্তি আমাদের ভাই। আমরা তার সাথে ভালোবাসার সম্পর্কে আবদ্ধ এবং তার যে কোন প্রয়োজনে আমরা তাকে সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। একইভাবে মুরতাদ আরবরা আমাদের শত্রু যদিও সে ইরাকি হয়ে থাকে। অবশ্যই বর্তমান মুসলিম উম্মাহের ঐক্য একমাত্র ইসলামের দ্বারাই সম্ভব। ইসলাম ও মুসলিম পরিচয় ব্যতীত আর কোন পথে এই উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না।

আর এই সকল মুরতাদদের যদি ইজ্জাহ, আত্মসম্মানবোধ ও ফিতরাহ এর কিছু বাকি থাকতো তবে তারা কুফফারদের হয়ে নিজ দেশে নিজ অধিবাসীদের দিকে বন্দুক তাক করতো না। এইভাবে কুফফারদের পতাকাতলে নিজ দেশের মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতো না। এ থেকে বুঝা যায় যে তারা যে জাতীয়তাবাদের কথা বলে আমাদেরেকে দোষী বানাতে চায় সেই জাতীয়তাবাদ তারা নিজেরাও খুব একটা মানে না। মানলে কীভাবে তারা নিজ দেশে শত্রুদের পক্ষ নিয়ে নিজের লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পরে? অথচ এই জাতীয়তাবাদকে তারা ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের চাইতেও উপরে স্থান দেয়। তাই তারা জাতীয়তাবাদের কথা বলে রক্তের পবিত্রতার যে দাবী জানায় তার যোগ্য তারা নয়।

বর্তমানে সময়ের মুসলমানদের যারা এই দ্বীন এর উপর থেকে সন্তুষ্ট তাদের প্রত্যেকের কুফফারদের কৌশলগুলো খুব খেয়াল করে পর্যালোচনা করা উচিত। ইসলামের শুরু থেকেই কুফফাররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম কৌশলের আশ্রয় নিয়ে আসছে। আক্রমণকারী পুলিশ ও সেনাবাহিনীদের গায়ে ‘ইরাকি রক্ত’ বলে তারা নতুন একটা জঘন্য কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। কুফফাররা যখন দেখল যে দুই নদীর এই পবিত্র ভূমিতে বিজয় অর্জন করতে পারছে না তখন তারা এখানকার মুরতাদ আর্মি ও পুলিশ বাহিনীর নিকট সাহায্য চাইলো। এরপর কুফফাররা দেখল যে এই মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরাও মুজাহিদিনদের হাতে ভেড়ার পালের মত জবাই হচ্ছে। এরপর কুফফাররা এই মুরতাদ বাহিনীকে বাঁচানোর মাধ্যমে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে রক্তের পবিত্রতার দাবী তুললো। তারা দাবী করছে যে, যেহেতু এই সকল মুরতাদ বাহিনীর দেহে ইরাকি রক্ত বইছে তাই তাদেরকে হত্যা করা বৈধ হবে না। এইভাবে জাতীয়তাবাদের বিষবাষ্পে তারা মুসলিমদের বিভক্ত করে নিজেদেরকে বাঁচাতে তৎপর।

তাই এখানে আমরা সারা পৃথিবীর সকলের উদ্দেশে ঘোষণা করছি যে,

আমরা আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকি। এই যুদ্ধে আমরা জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে কোন শত্রু-মিত্র নির্ধারণ করি না। আল্লাহ্ যেভাবে শত্রু-মিত্র নির্ধারণ করেছেন তাই আমরা অনুসরণ করি। আর এর মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা পোষণ করি। আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়মের উপরই আমরা চলার চেষ্টা করি এবং এর উপর থাকা অবস্থাই মৃত্যুবরণ করার আশা পোষণ করি।

শায়েখ আবদুল লতিফ ইবন আব্দুর রহমান বলেছেন-

“দ্বীন ইসলাম যে সকল মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে অন্যতম একটি হল- বান্দা আল্লাহ্র শত্রুদের ত্যাগ করবে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবে, তাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়বে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবে। আর তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ ও অস্বীকার করার মাধ্যমে বান্দা তার রবের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করবে।”[২]

সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার ও সাহাবিগণের উপর।

---

ফুটনোট-

(১) মাজমু আল- ফাতওয়া (৩/৪১৫)

(২) আর-রাসাইল আল-মুফিদাহ (পৃষ্ঠা-৬০)

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার আপনাকে শেখাবে ক্ষমতাসীন আর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে দেখতে। বিবিসি, সিএনএন, ভয়েস অফ অ্যামেরিকা আপনাকে শেখাবে পশ্চিমা কাফিরদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে বিচার করতে। আর আমরা আপনাকে জানাব আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট আর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান। তাই আমাদের সাথেই থাকুন, ইসলামের দৃষ্টিতে বাস্তবতাকে দেখতে নিয়মিত ভিজিট করুন।

https://dawahilallah.com/
https://alfirdaws.org/
http://gazwah.net/

আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল
সার্চ করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন

Ummah Network

Ummah News

Voice of Islam

IBADAH